ইউনিট ৩

ব্যক্তিগত জীবনে ইসলাম

ভূমিকা

ইসলাম এক পূর্ণাঙ্গ ও সর্বব্যাপক জীবন-বিধান। মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনের সমস্ত ক্ষেত্র ও ব্যাপার সম্পর্কে ইসলামের শিক্ষা অত্যন্ত সমুজ্জল। ব্যক্তি মানুষের চিন্তা চেতনা, আদর্শ, আকীদা-বিশ্বাস, মূল্যবোধ, নৈতিক, আচার-আচরণ, কার্যক্রম, তৎপরতা, স্রস্টার সাথে সম্পর্ক, অপর মানুষ ও সৃষ্টির সাথে সম্পর্ক, দায়-দায়িত্ব প্রভৃতি বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা দেয়। ইসলাম মানুষকে জীবনের সবকিছু, সবকটি দিক ও বিভাগেই বিধান দান করে। ইসলাম ব্যক্তি মানুষকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন ভাবে না। ব্যক্তি মানুষের সকল কার্যক্রমই ইসলামী সমাজ দর্শনের আলোকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত। ব্যক্তির বিশ্বাস, চিন্তা, চেতনা, নৈতিক আচার-আচরণ, ইবাদত, বন্দেগী, প্রার্থনা, তথা বস্তুগত, মানসিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক-সবদিকের লালন-পালন, বিকাশ ও উন্নয়নের শিক্ষা দেয় ইসলাম। এ সব ক্ষেত্রে স্বচ্ছ ও নির্ভেজাল পন্থা পদ্ধতি বলে দেয় ইসলাম। যাবতীয় কুসংস্কার, গোঁড়ামী, অসত্য, অন্যায়, ধর্মান্ধতা ও অস্বচ্ছ পথ থেকে ইসলাম ব্যক্তি মানুষকে রক্ষা করে বাতলে দেয় সরল সহজ সত্য সুন্দর আলোকিত পথ। যার মাধ্যমে মানুষ ইহলৌকিক শান্তি ও পারলৌকিক মুক্তি লাভ করবে। এর বিপরীত দিকে চলতে গেলেই মানুষের জীবনে রয়েছে ব্যর্থতা ও গ্লানি এবং পারলৌকিক শাস্তি, সে সব কথাও স্পষ্ট করে বলে দিয়েছে ইসলাম।

এই ইউনিটে আলোচিত বিষয়গুলো হলো-

পাঠ-১ : আত্ম-পরিচিতি ও আত্মশুদ্ধি

পাঠ-২ : মানব জীবনে উন্নতির উপায়

পাঠ-৩ : মানব জীবনে অবনতির কারণ

পাঠ-৪ : তাকওয়া

পাঠ-৫ : সিদক বা সত্যবাদিতা

পাঠ-৬ : সবর বা ধৈর্য

পাঠ-৭ : যিকর বা আল্লাহর স্মরণ

পাঠ-৮ : শোকর বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

পাঠ-৯ : কর্তব্য পরায়ণতা

পাঠ-১০ : হালাল উপার্জন

পাঠ-১১ : হারাম উপার্জন

পাঠ ১ আত্ম-পরিচিতি ও আত্মশুদ্ধি।

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- আত্ম-পরিচিতি দিতে পারবেন
- আত্ম-মর্যাদা বলতে পারবেন
- আত্ম-শুদ্ধি কি তা উল্লেখ করতে পারবেন
- আত্ম-শুদ্ধির গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন
- আত্ম-শুদ্ধির প্রয়োজনীয়তার বিবরণ দিতে পারবেন।

১.১ আত্ম পরিচিতি

মানুষ শুধু জীব নয়। ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ বস্তু সর্বস্ব নয়। নয় বস্তুনিরপেক্ষ কেবল আত্মা- সর্বস্ব। ইসলাম মানুষকে বস্তু ও রূহের সমন্বিত সত্তারূপে পেশ করেছে। আর এ দুটো জিনিস পরস্পর গভীরভাবে যুক্ত, সংশ্লিষ্ট এবং পরস্পর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্পন্ন। জন্তু ও জীবগুলোর জীবনকালের যাবতীয় দায়-দায়িত্ব মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়ে যায়। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে তা হয় না। মানুষ এমন সত্তাও নয়, যার ওপর আর কোন সম্মানিত কেউ নেই বলে মনে করা যেতে পারে।

১.২ আত্ম মর্যাদা

ইসলাম মানুষের সৃষ্টির মধ্যে বিশেষ সম্মান ও মর্যাদার কথা বলে। তবে তা সৃষ্টিগত নয় বরং মানুষের গুণাবলী অর্জনের মাধ্যমে তার অধিকারী হতে হয়। মানুষ যখন নিজেকে সঠিক ও যথার্থভাবে জানতে, চিনতে পারে এবং জ্ঞান ও বিবেক বুদ্ধি সম্পন্ন হয়, নিজেকে গড়ে তুলতে পারে তখনই মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। অন্যথা দেহ সর্বস্ব মানুষ অন্যান্য জীব-জন্তুর মতই থেকে যায়।

প্রতিটি মানুষের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য রয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে প্রতিটি মানুষ দায়বদ্ধ। ব্যক্তি তার প্রতিটি কাজের জন্য আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য। ইসলাম প্রতিটি ব্যক্তিকে সমাজের অঙ্গ বা সদস্য মনে করে। একাকী সে যা খুশি তা করে বেড়াতে পারে না।

পৃথিবীতে প্রতিটি মানুষ আল্লাহর খলীফা বা প্রতিনিধি। এ দায়িত্ব পালনের ফলে মানুষ অন্যান্য সৃষ্টিলোকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও মর্যাদাবান। আল্লাহর ঘোষণা-

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ
مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

"আমি আদম সন্তানকে বিশেষ সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছি, তাদেরকে যানবাহন দিয়েছি স্থল ও জলভাগে চলাচলের জন্য এবং তাদেরকে পবিত্র-পরিচ্ছন্ন উৎকৃষ্ট দ্রব্যাদি জীবিকা হিসেবে দিয়েছি এবং আমাদের সৃষ্টিসমূহের অনেকেরই ওপর শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য দিয়েছি। (সূরা বনী ইসরাইল : ৭০)

১.৩ আত্মশুদ্ধি

ইসলাম ব্যক্তি মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি, নৈতিকতা, বিবেক, মানবিকতা ও আত্মার পরিশুদ্ধতার কথা বলে। ব্যক্তি মানুষের পরিশুদ্ধির উপরই ব্যক্তি মানুষের জীবনের সফলতা এবং সমাজ-সভ্যতার সুষ্ঠুতা নির্ভর করে। এজন্য ইসলামী জীবন দর্শনে ব্যক্তি মানুষের আত্মশুদ্ধির উপর জোর তাগিদ দেয়। আত্মশুদ্ধি মানে নিজেকে সংশোধন, পরিশোধন করা এবং যাবতীয় কলুষ-কালিমা, পাপ-পংকিলতা থেকে পূত-পবিত্র ও মুক্ত রাখা। সব রকমের পাপ চিন্তা, অন্যায় অশ্লীলতা, অনৈতিক ও অনৈসলামিক কর্মকাণ্ড ও তৎপরতা থেকে নিজেকে মুক্ত ও পবিত্র রাখাই আত্মশুদ্ধি। অত্ম কথায় নিজেকে সংশোধন ও পরিশোধন ই আত্মশুদ্ধি। যাকে "তাযকিয়ায়ে নাফস" বলা হয়। এ আত্মপরিশুদ্ধি ছাড়া মানুষ নিজেকে পরিপূর্ণ মানুষে পরিণত করতে পারে না।

১.৪ আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

১. সমাজ-সভ্যতার সুস্থতার জন্য আত্মশুদ্ধি পূর্বশর্ত : মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা জীব। সমগ্র সৃষ্টির শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত মানব জাতির জন্য তাঁর প্রভুর পরিচয় জানা এবং প্রভুর ইচ্ছা অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা অতীব প্রয়োজনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ। আর এর মধ্যেই মানব জাতির শান্তি, কল্যাণ ও সমৃদ্ধি নিহিত রয়েছে। মানুষের সমাজ-সভ্যতাকে সুন্দর করার পূর্ব শর্ত হচ্ছে নিজের পরিশুদ্ধতা, নিজেকে পূত-পবিত্র রাখা। মন্দ পথে চললে, খারাপ কাজ করলে আত্মা কলুষিত হয়। আর ভালপথে চললে, ভাল কাজ করলে আত্মা পূত-পবিত্র, কলুষমুক্ত ও পরিশুদ্ধ থাকে।

মহান আল্লাহ বলেন-

كَلَّا بَلْ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ

"পাপের কারণে অন্তরসমূহ কলুষিত হয়েছে।"

আত্মশুদ্ধি বা আত্মাকে কলুষমুক্ত রাখাতেই সত্যিকার সাফল্য নিহিত। আল্লাহ বলেন-

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا- وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا

"যে ব্যক্তি আত্মাকে পূত-পবিত্র রাখল, সে সাফল্য লাভ করল। আর যে ব্যক্তি আত্মাকে কলুষিত করল, সে ধ্বংস হয়ে গেল।" (সূরা শামস : ১০-১১) হাদীসে আছে- মানবদেহে এমন এক টুকরা মাংস আছে, সে মাংস টুকরা যখন যথার্থরূপে পবিত্র হয়, তখন সমস্ত দেহই পবিত্র হয়, আর সে মাংস টুকরাটি যখন অপবিত্র হয়ে পড়ে, তখন সমস্ত দেহই অপবিত্র হয়ে যায়। আর তা হল কাল্‌ব বা অন্তর। (বুখারী ও মুসলিম)

আত্মাকে পরিশুদ্ধ ও পূত-পবিত্র এবং শক্তিশালী করতে হলে আল্লাহর যিকর ও সালাত আদায় করার জন্য আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন।
মহান আল্লাহ বলেন,

اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ

" জেনে রাখ, আল্লাহর স্মরণেই অন্তরাত্মার প্রশান্তি মেলে।" (সূরা রা'দ : ২৮)

২. আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের গুণাবলী অর্জনের জন্যে

আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে মানুষের প্রকৃত গুণাবলী অর্জন করা সহজ হয়। এর মাধ্যমে মানুষের প্রকৃত মর্যাদা, আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব করার জন্য মানুষের মৌলিক গুণাবলী এবং ঐ গুণাবলী অর্জন করার কৌশল সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায়।

ইসলামপূর্ব যুগে যে আরবরা ঝগড়া-বিবাদ, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, হত্যা-ব্যভিচার প্রভৃতি পাপাচারে লিপ্ত থাকতো, ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়ে তাঁরা একটি সুসভ্য, সুসংগঠিত, সমৃদ্ধ ও উন্নত জাতিতে পরিণত হয়েছিল। তাঁরা জ্ঞান-বিজ্ঞানে, মৌলিক মানবীয় গুণাবলী-স্নেহ, মায়া-মমতা, সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি, সহযোগিতা-সহমর্মিতায় উদ্দীপ্ত হয়ে উঠে এবং সারা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত হয়। এ সবই তারা আত্মার পরিশুদ্ধতা ও উন্নতির কারণে করতে পেরেছে।

বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ মানুষকে পরকালীন মুক্তি এনে দেবে। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন-

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُوْنَ- اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ

"যে দিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন কাজে আসবে না। (সে দিন মুক্তি পাবে সে) যে আল্লাহর কাছে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ নিয়ে আসবে।" (সূরা শুআরা : ৮৮-৮৯)

৩. স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টিতে

মহান স্রস্টা আল্লাহ ও সৃষ্টি মানুষের মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টিতে আত্মশুদ্ধি একান্ত অপরিহার্য। মানবাত্মা পূত-পবিত্র না হলে আল্লাহর সাথে মিলিত হতে পারে না। আল্লাহর সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করতে হলে মানবাত্মাকে পরিশুদ্ধ করে উচ্চতম ও যোগ্যতম করে গড়ে তুলতে হবে।

আত্মশুদ্ধি অর্জন করতে পারলে মানবাত্মা পরলোকে মহান প্রভু আল্লাহর দীদার ও দর্শন লাভে ধন্য হবে। আল মারুফ-আল-কারখী বলেন- “সূফীবাদ ঐশী সত্তার উপলব্ধির মাধ্যম।” জুননুন মিসরী বলেন- “খোদা ছাড়া আর সব কিছু পরিবর্জন করাই সূফীবাদ।” মহান আল্লাহর সাথে বান্দার ঘনিষ্ঠ ও সুনিবিড় সম্পর্ক স্থাপনই আত্মশুদ্ধির উদ্দেশ্য।

৫. আমলে নিষ্ঠা আসে

নেক আমলকে আল্লাহর নিকট গ্রহণীয় করার জন্য আত্মশুদ্ধির প্রয়োজন অনস্বীকার্য। যেমন- আল্লাহ বলেন-

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ

“তারাতো আদিষ্ট হয়েছিল আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধ চিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদত করতে”। (সূরা বায়্যিনাহ : ৫)

মহানবী (স) বলেন- “তোমরা এমন অনুভূতি নিয়ে আল্লাহর ইবাদত করবে, যেন আল্লাহকে দেখতে পাও। অথবা আল্লাহ তোমাকে দেখতে পান।”

ঈমানকে সুদৃঢ় ও মজবুত করার জন্য আত্মশুদ্ধির প্রয়োজন। কেননা, যত বড় অসুবিধা হোক না কেন, ঈমানের উপর অটল থাকা খুবই জরুরি। এটা আত্মশুদ্ধি ছাড়া সম্ভব নয়। মহানবী (স) বলেন- “যদি তোমাকে হত্যা করে বা আগুনে পোড়াতে না চায়, তবুও তুমি শিরক করো না।”

আত্মশুদ্ধির প্রধান তাৎপর্য হচ্ছে অন্তরকে যাবতীয় পাপের কালিমা থেকে মুক্তকরণ। মানুষের অন্তরে পাপের রোগ থাকে, সে রোগকে দূর করতে হয়। মহানবী (স) বলেন- “মু'মিন যখন কোন পাপ করে, তখন তাঁর অন্তরে কাল দাগ পড়ে। যখন সে তাওবা করে এবং ক্ষমা চায় তখন তা দূর হয়।”

৫. আত্মার প্রশান্তি ও বিকাশের জন্য

আত্মার উন্নতি, বিকাশ সাধন ও প্রশান্তি লাভের জন্য আত্মশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। পাপ পংকিলতার দ্বারা মানুষের আত্মার শান্তি দূর হয়ে যায়। পাপ কাজ ও পাপ চিন্তা মানুষকে ব্যতিব্যস্ত রাখে এবং সব সময় সে অশান্তিতে ভোগে। আল্লাহর স্মরণ ও আত্মার পবিত্রতা মানুষকে প্রশান্তি এনে দেয়। আল্লাহ বলেন- “আল্লাহ তাআলা যার অন্তরকে ইসলামের জন্য খুলে দেন, সে আল্লাহর নূরের আলোতে থাকেন।” কাজেই আত্মার উন্নতি, বিকাশ ও প্রশান্তির জন্য আত্মার পবিত্রতা ও পরিশোধন একান্ত দরকার। মন আল্লাহ প্রাপ্তির বড় মাধ্যম। এই ‘মন' কে আল্লাহর দিকে নিবিষ্ট করার জন্য মনকে নরম করা প্রয়োজন। পরিশুদ্ধ আত্মাই হৃদয়ের বিনম্রতা সৃষ্টি করে। আল্লাহ বলেন-

وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا

“করুণাময়ের বান্দারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে।” (সূরা ফুরকান : ৬৩)

৬. পশুত্ব দমন ও মনুষ্যত্বের বিকাশ

আত্মশুদ্ধির উদ্দেশ্য হলো পাশবিক চরিত্রকে দমন করে মানবিক চরিত্র সৃষ্টি করার মাধ্যমে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। ইমাম গাযালী (রা) বলেন- “অধ্যাত্মবিদ্যা এমনই যা মানুষকে পশু থেকে উন্নীত করে, মনুষ্যত্বের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছে দেয়।”

সুতরাং মানবিক গুণাবলী অর্জন ও পাশবিকতাসমূহ বর্জনের জন্য আত্মশুদ্ধির প্রয়োজন। মানবিক গুণাবলী যেমন তাওবা, তাওয়াক্কুল, সবর, ইখলাস, নিষ্ঠা, যোহদ, শোকর ও নির্জন নানা-সাধনা ইত্যাদি। আর পাশবিকতা হচ্ছে লোভ, মোহ, রাগ, হিংসা, অহংকার ইত্যাদি। কাজেই ইনসানে কামিল (انسان كامل) পূর্ণাঙ্গ মানুষ হওয়ার জন্য আত্মশুদ্ধির একান্ত দরকার।

মানুষ আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে মহৎ থেকে মহত্তর হতে পারে। আত্মার পরিশুদ্ধতা ও পবিত্রতাই মানুষকে আধ্যাত্মিক উন্নতি ও উৎকর্ষের সীমাহীন উচ্চাসনে আসীন করতে পারে। এরই মাধ্যমে স্রষ্টার সাথে মিলন ঘটতে পারে। কাজেই আত্মশুদ্ধিই ইসলামের মূল দর্শন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৩.১

ক. নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন : সঠিক উত্তরটি লিখুন।

১. ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ শুধু জন্তু / শুধু জীব / জন্তু ও রূহ সমন্বিত সত্তা।

২. "সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই"- কথাটি ইসলামের দৃষ্টিতে সত্য নয় / ইসলামেরই।

৩. মানুষের মর্যাদা মানুষ সৃষ্টিগতভাবেই সম্মানের অধিকারী / মানুষের গুণাবলী অর্জনের মাধ্যমে সন্মানের অধিকারী হতে হয় বংশ গৌরবে মর্যাদার অধিকারী হয়।

৪. মানুষ আল্লাহর কাছে দায়বদ্ধ ব্যক্তিগত ভাবে / সমাজগতভাবে / দায়বদ্ধ নয়।

৫. নিজেকে সংশোধন ও পরিশোধনই আত্মশুদ্ধি / আত্মোপলব্ধি / আত্ম সংশোধন।

৬. সমাজ সভ্যতার সুস্থতার জন্য আত্মশুদ্ধি প্রয়োজন নেই / পূর্বশর্ত / গৌণ বিষয়।

খ. সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. মানুষের আত্মপরিচিতি দিন।

২. আত্মশুদ্ধি কি?

৩. আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন।

৪. পশুত্ব দমন ও মনুষ্যত্ব বিকাশের জন্য আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব লিখুন।

পাঠ ২ মানব জীবনে উন্নতির উপায়

উদ্দেশ্য

এ পাঠ পড়ে আপনি-

- মানব জীবনে উন্নতির উপায়-কিভাবে হতে পারে তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- মানব জীবনে সত্যিকার উন্নতি বলতে কি বোঝায় তা নির্দেশ করতে পারবেন।
- মানব জীবনে উন্নতির জন্য কর্মপন্থা অবলম্বন করতে পারবেন।

২.১ মানব জীবনে উন্নতির উপায়

মহান স্রষ্টা আল্লাহ তায়ালা শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি- মানব জাতি। তিনি মানব জাতিকে পৃথিবীতে তাঁরই প্রতিনিধি বা খলীফা হিসেবে প্রেরণ করে জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং গুণ-গরিমায় অন্যান্য সৃষ্টির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। আর মহান আল্লাহ তায়ালার নির্দেশানুযায়ী যথাযথ জীবন পরিচালনা করার উপরই মানব জীবনের উন্নতি-উত্থান ও সফলতা একান্তভাবে নির্ভর করে। এখানে মানব জীবনে উন্নতির উপায়সমূহ আলোচিত হলো-

১. আল্লাহ তায়ালার দাসত্ব ও আনুগত্য

এ মহাবিশ্বের যা কিছু সৃষ্টি, তা সবই মানুষের কল্যাণের জন্য। আর মানব জাতিকে সৃস্টি করা হয়েছে মহান স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলার ইবাদত-বন্দেগী ও দাসত্ব-আনুগত্যের জন্য। এ মর্মে মহান আল্লাহর ঘোষণা :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

"আমি জ্বিন ও মানব জাতিকে একমাত্র আমার ইবাদত-বন্দেগীর জন্য সৃষ্টি করেছি।" (সূরা যারিয়াত : ৫৬)

কাজেই মানব জাতির ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সার্বিক কল্যাণ ও উন্নতি একমাত্র মহান আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্য করার মাধ্যমেই সম্ভব।

২. রাসূলের আদর্শ অনুসরণ

মানব জাতির সার্বিক উন্নতি ও মুক্তির জন্য রাসূলুল্লাহ (সা)- এর মহান জীবনাদর্শ অনুসরণ করা অপরিহার্য। মহান আল্লাহ এ প্রসঙ্গে বলেন :

"হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহ এবং তার রাসূলের এবং তোমাদের মধ্যে 'উলিল আমর' তথা দায়িত্বশীল নেতার আনুগত্য কর।" (নিসা : ৫)

মহান আল্লাহ আরো বলেন : "তোমাদের জন্য রাসূলের জীবন সর্বোত্তম জীবনাদর্শ।" এ মর্মে বিদায় হজ্জের ভাষণে নবী করীম (সা) বলেছেন :

"তোমাদের মধ্যে দু'টি বস্তু রেখে যাচ্ছি। যতদিন পর্যন্ত তোমরা এ বস্তু দু'টি আঁকড়ে থাকবে, ততদিন পর্যন্ত তোমরা পথ হারাবে না। আর তা হচ্ছে, আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর রাসূলের জীবনাদর্শ।"

বিশ্ব নবীর (সা) প্রদর্শিত পথই মানব জাতির জন্য একমাত্র সর্বোত্তম পথ, সে পথে চললে অবশ্যই মানব জীবনে উন্নতি ও সাফল্য আসবে।

৩. অবিচল ঈমান

মানব মনে যদি 'অবিচল ঈমান ও অটল বিশ্বাস' থাকে তবে সে উন্নতির স্বর্ণ শিখরে আরোহণ করতে পারে। মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন :

"তোমরা চিন্তিত হয়োনা এবং দু:খ করোনা, তোমরাই সাফল্য মণ্ডিত হবে, যদি তোমরা বিশ্বাসী বা ঈমানদার হয়ে থাকো।" (আলে ইমরান : ১৩৯)

৪. আমালে সালিহা

মানব জীবনে উন্নতির আরো একটি সোপান হচ্ছে, আমলে সালিহা বা সৎকর্ম। পৃথিবীতে যে সমস্ত উত্তম ও সৎ কার্যাবলী আছে, তা নিজে পালন করলে এবং অপরকে সে অনুযায়ী চলতে অনুপ্রাণিত করলে জীবনে উন্নতির পথ সুপ্রশস্ত হবে।

ঈমানের পরই আমালে সালিহা মানুষকে ধ্বংস থেকে বাঁচিয়ে উন্নতির দিকে নিয়ে আসে। যেমন সূরা আসরে আল্লাহ বলেছেন-

وَالْعَصْرِ ۝ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ ۝ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ

"কালের শপথ! মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত। তবে যারা ঈমান এনেছে এবং আমালে সালিহা করেছে তারা ধ্বংসশীল নয়।"
(সূরা 'আসরঃ ১-৩)

এভাবে পবিত্র কুরআন ও হাদীসে সৎকর্ম সম্পাদন করার মধ্যেই সাফল্য ও উন্নতি নিহিত সে কথা বহুবার বহুভাবে বলা আছে।

৫. সৎপথে ধৈর্যের সাথে অবিচল থাকা

মানব জীবনকে উন্নত ও সাফল্যমণ্ডিত করার অন্যতম উপায় হচ্ছে, সৎপথে পূর্ণ ধৈর্যের সাথে অবিচল থাকা। সৎপথে, ন্যায়ের পথে, ইসলামের পথে চলতে গেলে বহু বাধা-বিঘ্ন, চড়াই-উৎরাই আসবে আর সে সব অবস্থায় ধৈর্যের সাথে অবিচল থাকলেই উন্নতি ও সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হওয়া যায়। যেমন : সূরা আসরের শেষে বলা হয়েছে-

وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

"এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় ও ধৈর্যের উপদেশ দেয়।"

৬. মন-মানসের পবিত্রতা

মানব জীবনে উন্নতি লাভ করতে হলে মানুষের মন, মানস ও হৃদয়বৃত্তি সুস্থ ও পুতপবিত্র রাখতে হবে। স্বচ্ছ ও নির্মল মন নিয়ে আল্লাহ তায়ালার স্মরণের মধ্যেই নিহিত রয়েছে মানবাত্মার প্রকৃত প্রশান্তি ও উৎকর্ষ। মনের স্থিতিশীলতা ও সতেজ মনের মাঝেই রয়েছে আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ ও করুণা। আর এ পথে পরিচালিত জীবনেই রয়েছে পরম শান্তি ও সফলতা। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন :

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا

"যে ব্যক্তি অন্তর পবিত্র করেছে, সে নিশ্চয়ই সফলতা লাভ করেছে।" বস্তুত মানবিক প্রকৃত উন্নতির পথ হলো আত্মা বা মনের পবিত্রতা ও পরিশুদ্ধতা।

৭. যাবতীয় মিথ্যা পরিহার ও সত্য গ্রহণ

মহানবীর (সা)-এর বাণী : اَلصِّدْقُ يُنْجِيْ وَالْكِذْبُ يُهْلِكُ

"সত্য মানুষকে মুক্তি দেয় আর মিথ্যা ধ্বংস করে।" কাজেই যাবতীয় মিথ্যা তথা মিথ্যা বলা, চুরি করা, ডাকাতি করা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া, অপরের সম্পদ লুণ্ঠন করা বা ভোগ করা, অন্যায়-অশ্লীল পথে চলা প্রভৃতি মিথ্যা ও অসৎ কর্ম পরিহার করে সত্য-সুন্দর পথ গ্রহণ করার মধ্যেই মানব জীবনের উন্নতি ও সফলতা নির্ভর করে।

৮. মানবীয় চেষ্টা সাধনা

মানুষ স্বীয় মানবীয় চেষ্টা, সাধনা ও পরিশ্রমের মাধ্যমে জাগতিক ও বৈষয়িক উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে উপনীত হতে পারে। যেমন- আল্লাহর ঘোষণা : لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰى

"মানুষ চেষ্টা সাধনা ছাড়া কিছুই লাভ করতে পারেনা।" বস্তুতঃ চেষ্টার মাধ্যমেই মানুষ শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে সক্ষম হয়। আর এ চেষ্টার সাথে সাথে ঈমানী চেতনার 'সংযোগ থাকলে পার্থিব ও পারত্রিক উভয় জগতের উন্নতি এবং শান্তি লাভ করতে পারবে। পরিশ্রম ও চেষ্টা ব্যতিরেকে কোন মানব বা মানব জাতির উন্নতি সম্ভব নয়। যেমন মহান আল্লাহ ঘোষণা করেনঃ
"নিশ্চয়ই আল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন (উন্নতি-অবনতি) করেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে জাতি নিজের অবস্থার পরিবর্তনে সচেষ্ট না হয়।" (সূরা রা'দ : ১১)

১০. কুরআনের আলোকে চরিত্র গঠন

মানব জীবনের প্রকৃত উন্নয়ন তখন সম্ভব, যখন তার জীবন-চরিত্র কুরআনিক চরিত্রে গঠিত হয়। এ মর্মে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন : "নিশ্চয়ই সে সকল মুমিন সফলকাম হয়েছে যারা (ক) সালাতে বিনয়াবনত (খ) যারা অনর্থক কথা থেকে দূরে থাকে (গ) যারা যাকাত আদায় করে (ঘ) যারা নিজেদের গুপ্তাংগের হেফাযত করে (স) যারা আমানত ও ওয়াদা রক্ষা করে এবং (চ) যারা সালাতের হিফাযত করে। তারাই হলো জান্নাতুল ফিরদাউসের উত্তরাধিকারী- সেখানে তারা চিরদিন অবস্থান করবে।" (সূরা মু'মিনুন)

সার-সংক্ষেপ
মানব জীবনে প্রকৃত উন্নতি ও সফলতা আসতে পারে একমাত্র আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল (সা) প্রদর্শিত পথে চলার মাধ্যমে। মৌলিক মানবীয় গুণাবলী ও যোগ্যতার বিকাশ সাধনের দ্বারা জাগতিক ও বৈষয়িক সফলতা এবং তারই সাথে ঈমান ও সৎগুণাবলীর সংযোগ ঘটিয়ে ইহ-পরকালীন চিরন্তন-শাশ্বত উন্নতি ও সফলতার উচ্চ শিখরে সমাসীন হওয়া সম্ভব।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৩.২

ক. নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন : এক কথায় উত্তর দিন।

১. মানুষকে কেন সৃষ্টি করা হয়েছে?

২. "রাসূলের আদর্শ অনুসরণেই মানব জীবনে উন্নতি ও সাফল্য আসবে"- ব্যাখ্যা করুন।

৩. মানব জাতির জন্য উন্নতি ও সাফল্যের একমাত্র সর্বোত্তম পথ কোনটি?

৪. মানুষকে ধ্বংস হতে বাঁচিয়ে উন্নতির দিকে নিয়ে যায় কোন জিনিস?

৫. মানব জীবনের প্রকৃত উন্নতি ও সফলতা আসতে পারে কোন পথে?

খ. সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. মানুষকে কেন সৃষ্টি করা হয়েছে?

২. "রাসূলের আদর্শ অনুসরণেই মানব জীবনে উন্নতি ও সাফল্য আসবে"- ব্যাখ্যা করুন।

৩. মানব জীবনে উন্নতির উপায়গুলো বর্ণনা করুন।

৪. মানবীয় চেষ্টা-সাধনা মানব জীবনে উন্নতির জন্য কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করুন।

৫. 'কুরআনিক চরিত্র গঠন' বলতে কি বুঝানো হয়েছে? আলোচনা করুন।

পাঠ ৩ মানব জীবনে অবনতির কারণ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- মানব জীবনে অবনতির কারণ বিশ্লেষণ করুন
- কুফরি বা খোদাদ্রোহীতা মানব জীবনে অবনতির মূল কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- মানব জীবনে অবনতির অন্যান্য কারণ উল্লেখ করতে পারবেন।

৩.১ মানব জীবনে অবনতির কারণসমূহ

মহান আল্লাহ তায়ালা মানব জাতিকে এ সুন্দর বসুন্ধরায় পাঠিয়েছেন তাঁরই প্রতিনিধি হিসেবে, তারই দাসত্ব ও আকাংখার রূপায়ন ঘটানোর জন্য। কিন্তু মানব জাতি নিজেদের কুপ্রবৃত্তির তাড়নায় ও মানবের আজন্ম দুশমন শয়তানের প্ররোচনায় নিজেদের দায়িত্ব-কর্তব্য হতে বিচ্যুত হয়ে মহান স্রস্টার অবাধ্যতা ও নাফরমানী করে নিজেদের জীবন অবনতি ও ধ্বংসের অতলান্তিক গহ্বরের পানে নিয়ে যায়।

পবিত্র কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা পর্যালোচনা করলে মানব জাতির অবনতির কারণ হিসেবে নিম্নোক্ত কারণ পরিলক্ষিত হয় :

১. কুফরী বা খোদাদ্রোহিতা

কুফরী বা খোদাদ্রোহীতা তথা আল্লাহর অবাধ্যতা মানবকে ধ্বংস ও অবনতির দিকে দ্রুত টেনে নেয়। কেননা, মানব সন্তান পৃথিবীর আঙ্গিনায় পদার্পনের বহু পূর্ব হতেই তার জন্য অফুরন্ত নিয়ামত দিয়ে সাজানো হয়ে থাকে। আর সে জন্ম লগ্ন থেকে জীবনাবসান অবধি ভোগ-ব্যবহার করে অপার করুণাময় স্রষ্টার অজস্র নিয়ামত ও দান। যেমন এ মর্মে মহান আল্লাহর ঘোষণা-

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا

"আল্লাহ পৃথিবীর সমুদয় বস্তু তোমাদের অনুগত করে দিয়েছেন।" কিন্তু মানব সে সমস্ত নিয়ামত দানকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করে বরং তাকেই অস্বীকার করে বসে এবং তাঁর নাফরমানীতে লিপ্ত হয়। তাই আল্লাহ তায়ালা বলেন :

كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ۚ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ

"কিভাবে তোমরা আল্লাহকে অস্বীকার কর! অথচ তোমরা ছিলে নির্জীব- তিনি জীবন দিলেন; আবার তোমাদের জীবন কেড়ে নেবেন; অতঃপর পুনরায় জীবন দান করবেন। শেষাবধি তাঁরই নিকট তোমাদের ফিরে যেতে হবে।" (বাকারা : ২৮)

সুতরাং কুফরী ও নাফরমানী করতে করতে মানুষ আল্লাহর করুণা ও সান্নিধ্য হতে যখন বহু দূরে চলে যায় এবং নাফরমানী যখন চরম আকার ধারণ করে, তখন তারা ধ্বংসের গহীন গহ্বরে নিপতিত হয়। ঈমান ও সৎকাজ ছাড়া সেখান থেকে মুক্তির কোন পথ নেই। এ কথাই বলা হয়েছে কুরআনে :

وَالْعَصْرِ ۝ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ ۝ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ

"কালের শপথ! মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত, তবে যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে তারা ব্যতীত।"

২. শিরক বা অংশীবাদিতা

একক, অদ্বিতীয় ও অনুপম মহান আল্লাহর সাথে শরীক করে মানুষ চরম অবনতি ও ধ্বংসের দিকে ধাবিত হয়। অংশীবাদী মানুষ মহান আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা স্বীকার করে ঠিকই; কিন্তু আবার তাঁরই সৃষ্ট বস্তুকে তাঁর অংশীদার মনে করে পূজা-অর্চনা, স্তব-স্তুতি করে। কিংবা প্রচ্ছন্ন শিরকে লিপ্ত হয়ে গায়রুল্লাহকে প্রয়োজন পূরণকারী, শান্তিদাতা, বিধানদাতা, শক্তির উৎস মনে

করে। মানুষ নিজের উপর যুলুম করে এবং আল্লাহর নিরংকুশ ক্ষমতায় অনধিকার চর্চা করে। এ শিরকবাদ সৃষ্টিকর্তার প্রতি চরম অবমাননা ও মারাত্মক যুলুম। যেমন- কুরআন এ ব্যাপারে বলে :

إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

"নিশ্চয়ই শিরকবাদ বিরাট জুলুম।" (সূরা লুকমান : ১৩)

আর মানব এ ঘৃণ্য ও জঘন্য অপরাধ এবং চরম যুলুম শিরক নিমজ্জিত হয়ে ধ্বংস ও অবনতির অতলতলে হারিয়ে যায়। কেননা করুণাময় আল্লাহ শিরকবাদীদের কখনই ক্ষমা করবেন না এবং মুক্তি দেবেন না।

৩. মুনাফিকী

নিফাকের মাধ্যমে ও মানুষ নিজেকে ধ্বংসের পথে চালিত করে। (ক) 'নিফাক-ফিল ঈমান' তথা বিশ্বাসগত মুনাফিকী ও (খ) নিফাক-ফিল-আমল' অর্থাৎ মুনাফিকী কাজ উভয় প্রকার নিফাকই জঘন্য মনোবৃত্তি ও ঘৃণ্য অপরাধমূলক কাজ। মুনাফিকরা সমাজের সুবিধা ভোগী শ্রেণীর ঘৃণিত বিশৃংখলা ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারী, নিফাকী ও প্রতিশ্রুতি ভংগকারী জঘন্য প্রকৃতির মানুষ, এরা সর্বজন ঘৃণিত ও অবিশ্বাস্য। তাই এদের ইহ-পরকালে ধ্বংস অনিবার্য। যেমন মহান আল্লাহর বাণী :

إِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ

"নিশ্চয়ই মুনাফিকরা নরকাগ্নির গহীনতম গহ্বরে অবস্থান করবে।" (সূরা নিসা : ১৪৫)

৪. ইবাদত ত্যাগ

মহান আল্লাহ তায়ালা মানব জাতিকে তাঁর দাসত্ব ও আনুগত্য করার জন্য সৃষ্টি করেছেন। যেমন আল্লাহর ঘোষণা :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ

"মানব ও দানব জাতিকে আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি।" (যারিয়াত : ৫৬)

কিন্তু মানব জাতি তার জীবনে যদি আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্য মেনে না নেয় তবে তার ধ্বংস অনিবার্য।

৫. কুরআন ও সুন্নাহ হতে বিচ্যুতি : কুরআন ও সুন্নাহ হচ্ছে মানব জাতির জন্য হিদায়াত ও মুক্তির পথ। বিদায় হজ্জের ভাষণে মহানবী (সা) দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন :

"আমি তোমাদের মাঝে দু'টো বস্তু রেখে যাচ্ছি যা অনুসরণ করে চললে তোমরা কখনো গোমরাহ হবে না, তা হচ্ছে কুরআন ও আমার সুন্নাহ।"

সুতরাং এ কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণ না করলেই মানবজাতি অবনতি ও ধ্বংসের পথে চালিত হবে।

৬. সৎকাজ বর্জন

মহান আল্লাহ তায়ালা মানব জাতিকে অন্যায়, অসৎ ও খারাপ এবং অকল্যাণকর কাজ বর্জন করে সৎকাজ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু মানুষ যদি সৎকাজ বর্জন করে অন্যায় কাজে লিপ্ত হয় তবে তাদের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী।

৭. পাপ কাজে লিপ্ত

মানুষ যদি পাপকাজে লিপ্ত হয় অর্থাৎ সুদ, ঘুষ, মদ, জুয়া, ব্যাভিচার ইত্যাদি জঘন্য পাপাচারে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তবে এ সকল পাপকাজ মানব জীবনকে অবনতি ও ধ্বংসের পথে টেনে নেয়।

৮. মিথ্যার আশ্রয়

মানুষ যদি সত্যকে অগ্রাহ্য করে মিথ্যাশ্রয়ী হয়, মিথ্যাবাদের উপর জীবন পরিচালনা করে তবে মানুষকে মিথ্যাচার ধ্বংসের গভীরতম স্থানে নিপতিত করে। মহানবীর (সা)-এর হাদীসে উল্লেখ আছে:

اَلصِّدْقُ يُنْجِىْ وَالْكِذْبُ يُهْلِكُ

"সত্য মানুষকে মুক্তি দেয়, মিথ্যা ধ্বংস করে।"

৯. সীমা লংঘন

আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সকল ব্যাপারে ও সকল কাজে বৈধ সীমারেখায় থেকে জীবন পরিচালনার নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু মানুষ যদি সীমালংঘন করে চলে, তবে তার ধ্বংস অনিবার্য।

১০. অন্তরের কালিমা

মানব জীবনে অবনতির বড় কারণের মধ্যে অন্তরের কলূষ-কালিমা ও বক্রতা অন্যতম। মহান আল্লাহ এ মর্মে ঘোষণা করেন:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا - وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا

"যে হৃদয় বৃত্তিকে বিমল করেছে, সে সফলতা লাভ করেছে আর যে হৃদয় বৃত্তিকে অপবিত্র কলুষ-কালিমালিপ্ত করেছে, সে ধ্বংস হয়েছে।"

সার-সংক্ষেপ

পাপরাশি ও খারাপ কার্যাবলীর কারণে মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবন অত্যন্ত শোচনীয় ও অভিশপ্ত হয়ে পড়ে। যার ফলশ্রুতিতে মানব জীবনে নেমে আসে ধ্বংস এবং অবক্ষয়-অবনতির কালো ছায়া। অতএব, আমাদেরকে উক্ত কার্যাবলী হতে বিরত থেকে আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল (সা) প্রদর্শিত পথে চলে উন্নতির সর্বোচ্চ সোপানে আরোহণ করার চেষ্টা করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৩.৩

ক. নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন : সত্য মিথ্যা নির্ণয় করুন।

১. কুফরি তথা আল্লাহর অবাধ্যতা মানুষকে ধ্বংসের দিকে দ্রুত ধাবিত করে।

২. ঈমান ও সৎকাজ মুক্তির উপায়।

৩. শিরকবাদ মানুষের জীবনে কোন ক্ষতি করে না।

৪. মুনাফিকরা সমাজের সংশোধনবাদী ও শান্তিকামী।

৫. কুরআন ও সুন্নাহ হচ্ছে মানব জাতির জন্য হিদায়াত ও মুক্তির পথ।

খ. সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. মানবজাতির অবনতির কারণ মূল্যায়ন বর্ণনা করুন।

২. মানব জাতির অবনতি কেন হয়? বিবরণ দিন।

৩. "কুফরি আল্লাহদ্রোহীতা মানবকে ধ্বংস ও অবনতির দিকে ধাবিত করে"- ব্যাখ্যা করুন।

৪. "শিরকী ও নিফাকী মানব জীবনের জন্য ধ্বংস স্বরূপ"- আলোচনা করুন।

পাঠ ৪ তাকওয়া

উদ্দেশ্য

এ পাঠ পড়ে আপনি-

- তাকওয়ার পরিচয় দিতে পারবেন
- মুত্তাকীর বৈশিষ্ট্য বলতে পারবেন
- তাকওয়ার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

৪.১ তাকওয়ার পরিচয়

তাকওয়া শব্দের অর্থ– ভয় করা, বিরত থাকা, রক্ষা করা, পরহেযগারী, নিজকে কোন বিপদ ও অকল্যাণ থেকে সম্ভাব্য সকল উপায়ে বাঁচিয়ে রাখা বা কোন অনিষ্ট হতে আপনাকে দূরে রাখা ইত্যাদি।

"সকল প্রকার অন্যায় ও অনাচার বর্জন করে কুর'আন ও সুন্নাহের নির্দেশ মতো জীবন-যাপনের মাধ্যমে আল্লাহকে প্রতিনিয়ত প্রেমমাখা ভয় করে চলাকে তাকওয়া বলে।" যিনি এ অতীব মহৎ গুণের অধিকারী তিনি মুত্তাকী [বহুবচনে মুত্তাকীন] বলে অভিহিত হন।

ইসলাম মানবকে যে সব চিন্তা, তৎপরতা, কথা, কাজ প্রভৃতি বিষয় নিষেধ করেছে, তা পরিহার করে, তথা যাবতীয় মন্দ, অশ্লীল ও অকল্যাণকর দিক বর্জন করে শুভ এবং কল্যাণময় দিকগুলো গ্রহণ করাই তাকওয়ার বাস্তবতা।

ইসলামী জীবন দর্শনে তাকওয়াই সকল সৎগুণের মূল। তাকওয়া একটি মহৎ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। মানুষের ব্যক্তি চরিত্র ও সামাজিক চরিত্র গঠনে তাকওয়ার গুরুত্ব অপরিসীম। ব্যক্তি চরিত্র গঠনে তাকওয়া একটি সুদৃঢ় দুর্গস্বরূপ। যার মধ্যে তাকওয়া আছে, সে সর্বদা আল্লাহর উপস্থিতি অনুভব করে। আর যে আল্লাহকে হাজির নাযির জানে, সে কোন পাপ কাজে জড়াতে পারে না। অপর দিকে যার মধ্যে তাকওয়া নেই, তার দ্বারা সকল অপকর্ম করাই সম্ভব। সুতরাং তাকওয়া সুন্দর, পরিচ্ছন্ন, পরিশুদ্ধ ও সৎ জীবন যাপনের মূল কথা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

"যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর তাহলে তিনি তোমাদেরকে ভাল-মন্দের মধ্যে পার্থক্য করার মানদণ্ড বা যোগ্যতা ও শক্তি দান করবেন। তোমাদের পাপ মোচন করবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। কেননা, আল্লাহ বড়ই অনুগ্রহশীল।" (সূরা আনফাল : ২৯)

এ তাকওয়া অবলম্বন করার সুফল ও পুরস্কার হিসেবে আল্লাহ বলেন : "যে বক্তি আল্লাহর সামনে দাঁড়াবার ভয় করে এবং নিজেকে কু-প্রবৃত্তি ও জৈবিক চাহিদা থেকে বিরত রাখে, তার স্থান হবে জান্নাতে।" (সূরা নাযিয়াত : ৪০–৪১)

৪.২. ব্যক্তিগত জীবনে তাকওয়ার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

ব্যক্তি চরিত্র গঠনে : মানুষের ব্যক্তি জীবনে তাকওয়ার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। যে মু'মিনের হৃদয়ে তাকওয়া আছে, সে কোন অবস্থায়ই প্রলোভনে পড়ে না এবং নির্জন থেকে নির্জনতর স্থানেও পাপ কাজে লিপ্ত হয় না। তাই চরিত্র গঠনে তাকওয়া একটি সুদৃঢ় দুর্গস্বরূপ।

ইবাদতের মূল বস্তু : তাকওয়া হচ্ছে ইবাদত-বন্দেগীর মূল বস্তু। ইবাদতের আনুষ্ঠানিকতার কোন মূল্য নেই, যদি সেখানে তাকওয়া বা আল্লাহর ভয় না থাকে। আল্লাহর ঘোষণা :

لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ

"আল্লাহর কাছে তোমাদের কুরবাণীর গোশত, রক্ত কিছুই পৌঁছে না, পৌছে শুধু তাকওয়া।" (সূরা হাজ্জ : ৩৭)

ঈমানের পরিপূর্ণতা : আল্লাহ তা'আলাকে যথাযথভাবে ভয় না করলে, ঈমানের পরিপূর্ণতা আসেনা। তাই আল্লাহ তাকওয়া অর্জনের নির্দেশ দিয়ে ঘোষণা করেন : "হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে যথাযথভাবে ভয় কর এবং আল্লাহর কাছে পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ না করে মৃত্যু বরণ করোনা।" (সূরা আলে ইমরান : ১০২)

আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ : আল্লাহর সান্নিধ্য, নৈকট্য ও সহায়তা লাভের জন্য তাকওয়া অবলম্বন করা অপরিহার্য। আল্লাহ বলেন :

وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ

"তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। কেননা, জেনে রেখ আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে আছেন।" (সূরা বাকারা ২:১৯৪)

আল্লাহর নিকট তাকওয়াই হচ্ছে শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা লাভের মাপকাঠি। আল্লাহর ঘোষণা :

اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ

"তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি বেশি মর্যাদাবান, যার মধ্যে বেশি তাকওয়া আছে।" (সূরা হুজুরাত : ১৩)

জীবনের সাফল্য

তাকওয়ার গুণই মানুষের ইহ-পরকালীন জীবনে সামগ্রিক সাফল্য বয়ে আনবে। আল্লাহ বলেন :

اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ مَفَازًا

"নিশ্চয়ই তাকওয়াবানদের জন্যে রয়েছে সফলতা।" (সূরা নাবা : ৩১)

মানুষের আত্মার পরিশুদ্ধি ও পরিশোধনের জন্য তাকওয়া একান্ত অপরিহার্য। হৃদয়ে তাকওয়া থাকলে সে মানুষ কোন অন্যায়-অশ্লীল কাজ করতে পারে না এবং কোন পাপ চিন্তা তার আত্মাকে কলুষিত করতে পারেনা।

তাকওয়া ব্যক্তি মানুষের চরিত্রে, তার আকীদা-বিশ্বাসে, কাজে-কর্মে, আচার-আচরণে, ইবাদত-বন্দেগীতে এবং দায়িত্ব পালনে নিষ্ঠার সৃষ্টি করে।

মজবুতী : তাকওয়া মানুষের ঈমানের মজবুতী ও পূর্ণতা এনে দেয়। যে ব্যক্তি যত তাকওয়াসম্পন্ন, তার ঈমান তত বেশি মজবুত। সে জীবনে-মরণে কখনো তাকওয়া থেকে এতটুকু বিচ্যুত হয় না।

তাকওয়া মানুষকে জাহান্নামের ভয়াবহ কঠিন শাস্তি হতে মুক্তি দান করে। মহানবী (স) এ বিষয়ে বলেন, 'জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূল হলো আল্লাহর ভয়। তিনি আরো বলেন, সেই দু'টো চোখকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না– (১) যে চোখ আল্লাহর ভয়ে অশ্রু ঝরায়, (২) আর যে চোখ আল্লাহ্র রাস্তায় পাহারায় রত থেকে কাঁদে। –(তিরমিযী)

জান্নাত লাভ : তাকওয়াবান মানুষ নিশ্চিতভাবে জান্নাত লাভ করবে, আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى ۙ فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَاْوٰى

"আর যে ব্যক্তি নিজের প্রভুর সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয় পোষণ করে এবং কু-প্রবৃত্তি হতে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে, জান্নাত-ই হবে তাদের বাসস্থান।" –(সূরা নাযিয়াত : ৪০-৪১)

তাকওয়ার গুণ অর্জিত হলে মানবজীবনের সবচেয়ে বড় নি'আমত আল্লাহর সন্তুষ্টি ও ভালবাসা লাভ করা যায়। স্বয়ং আল্লাহ বলেন :

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ

"অবশ্যই আল্লাহ মুত্তাকীদেরকে ভালবাসেন।" –(সূরা তাওবা ৯:৪)

৪.৩ সামাজিক জীবনে তাকওয়ার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

সুষ্ঠ সমাজ গঠনে-একটি সমাজকে সুন্দর, সুষ্ঠু, পূত-পবিত্র, পরিশুদ্ধ সর্বোপরি সমৃদ্ধশালী করতে হলে ইসলামী আখলাকের প্রধান গুণ তাকওয়ার একান্ত প্রয়োজন। তাকওয়াবান মানুষ না হলে, একটি সুন্দর শান্তিময় সমাজ গড়ে তোলা যায় না। তাই সমাজের সকল সদস্যকে তাকওয়ার জীবন অবলম্বন করা অপরিহার্য।

সমাজে শান্তি-শৃক্মখলা রক্ষায় তাকওয়া একান্ত অপরিহার্য। কেননা, তাকওয়াবান মানুষ তার কাজ কর্মে আন্তরিক ও নিষ্ঠাবান। আর আন্তরিক ও নিষ্ঠার সাথে সমাজের সদস্যগণ যদি দায়িত্ব পালন করেন, তবে সে সমাজ অবশ্যই শান্তি ও শৃক্মখলময় হতে বাধ্য।

তাকওয়া সমাজের মানুষের মধ্যে সামাজিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করে। তাই একজন তাকওয়াবান মানুষ কখনও অপরের অধিকার হরণ করে না, অপরকে কষ্ট দেয় না, অন্যায়-অত্যাচার থেকে নিজে বেঁচে থাকে, সমাজকে এ থেকে বাঁচায়।

সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় তাকওয়া

সামাজিক ন্যায়বিচার ও ন্যায়-নীতি প্রতিষ্ঠার জন্য তাকওয়া একান্ত প্রয়োজনীয় গুণ। তাকওয়াবান মানুষ সমাজে কখনও ন্যায়-নীতির বিপরীত কোন কাজ হতে দেয় না এবং সে নিজেও করেনা। আল্লাহ বলেন :

اِعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى

"তোমরা ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা কর। কেননা, ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা তাকওয়ার খুব নিকটবর্তী।" (সূরা মায়িদা ৫: ৮)

সামাজিক নিরাপত্তা পারস্পরিক বিশ্বাস ও আস্থা সৃষ্টির জন্য তাকওয়া অবলম্বন করা একান্ত প্রয়োজন। তাকওয়াবিহীন সমাজে সামাজিক আস্থা ও নিরাপত্তা গড়ে উঠে না।

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে তাকওয়া

যদি সমাজের লোকদের মধ্যে তাকওয়ার গুণ থাকে, তবে তারা সততা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে সমাজের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও উৎকর্ষের জন্য কাজ করে থাকে। আর দায়িত্ব পালনে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার মূল উৎস হচ্ছে তাকওয়া বা আল্লাহভীতি। তাই আর্থ-সামাজিক সমৃদ্ধির জন্য তাকওয়াবান হওয়া অপরিহার্য।

সুনাগরিকতার গুণ অর্জনে তাকওয়া

সুনাগরিকতার প্রধান গুণ তথা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ। আর তাকওয়া থেকেই নাগরিকদের মধ্যে দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ জাগরিত হয়।

সংহতিতে : তাকওয়া বা আল্লাহভীতি মানুষের মনে অপর মানুষের প্রতি ভালবাসা, মর্যাদা ও শ্রদ্ধা-স্নেহ সৃষ্টি করে। মানুষে মানুষে সাম্য, সম্প্রীতি ও সংহতি গড়ে তোলে। যাবতীয় ভেদ-বৈষম্য ও পার্থক্য দূরীভূত করে আল্লাহর বান্দা হিসেবে সকলে মিলেমিশে থাকে।

সমাজে সর্বোত্তম ব্যক্তিগণ সমাদৃত হয় এবং মর্যাদা পায়। আর সর্বোত্তম ব্যক্তিত্ব অর্জনের জন্য তাকওয়ার গুণ অর্জন করা একান্ত দরকার।

৪.৪ তাকওয়াবিহীন জীবনের পার্থিব ও পারলৌকিক পরিণতি

কোন ব্যক্তির জীবনে বা সমাজের মানুষের মধ্যে যদি তাকওয়া না থাকে, তবে সে ব্যক্তির বা সমাজের সামগ্রিক অঙ্গনে মারাত্মক কুফল দেখা দেয়। তাদের পার্থিব জীবন হয় অশান্তিতে ভরা, আর পারলৌকিক জীবনে এর পরিণতি খুবই ভয়াবহ হবে।

তাকওয়ার অভাবে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে নানা জটিলতা দেখা দেয়। মানুষের মনে যখন আল্লাহর ভয় না থাকে, তখন সে যে কোন পাপচিন্তা ও গুনাহের কাজে লিপ্ত হয়ে থাকে। ন্যায়-অন্যায় বোধ তার মধ্যে থাকে না। মূল্যবোধ সৃষ্টি হয় না। যার ফলে মানুষ ব্যক্তিগত বা সমাজগতভাবে দুর্নীতি পরায়ণ হয়। মিথ্যা, প্রতারণা, কর্তব্যে অবহেলা, দায়িত্ব পালনে গাফলতি প্রভৃতি নানা জটিলতায় সমাজ হাবু-ডুবু খেতে থাকে। তখন সমাজ আর বাসোপযোগী থাকে না। জাহান্নামের অগ্নিকুণ্ডের মত অশান্তি আর অস্থিরতায় সমাজ জীবন দুর্বিসহ হয়ে পড়ে। আল্লাহ বলেন :

مَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا ۙ وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

"যারা আল্লাহকে ভয় করে তাকওয়ার জীবন অবলম্বন করে, আল্লাহ তাদেরকে সকল জটিলতা থেকে মুক্তি লাভের উপায় বলে দেন এবং তাঁদের জন্য এমন পদ্ধতিতে জীবনোপকরণের ব্যবস্থা করে দেন, তাঁরা যা কল্পনাও করে না।" (সূরা ত্বালাক : ৩)

তাকওয়া বিহীন জীবন জাহান্নামে শাস্তি ভোগ করবে। জাহান্নাম হবে তাদের ঠিকানা। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

فَاَمَّا مَنْ طَغٰى ۙ وَاٰثَرَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ۙ فَاِنَّ الْجَحِيْمَ هِيَ الْمَاْوٰى

"যে ব্যক্তি নাফরমানী করে এবং পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দেয়, জাহান্নামই তার ঠিকানা।"

তাকওয়া বিহীন জীবন মানুষকে পাপের দিকে আকৃষ্ট ও ধাবিত করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন -

اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌۢ بِالسُّوْٓءِ

"নিশ্চয়ই কুপ্রবৃত্তি খারাপ কাজ করার জন্য নির্দেশ দেয়।" (সূরা ইউসুফ : ৫৩)

তাকওয়া না থাকলে সমাজে ন্যায় বিচার ও ন্যায়-নীতি প্রতিষ্ঠিত হয় না। সমাজ হয় অন্যায়-অবিচারে দুর্দশাগ্রস্ত।

যে ব্যক্তি ও সমাজে তাকওয়া নেই, সে ব্যক্তি ও সমাজে মূল্যবোধ থাকে না। আর মূল্যবোধহীন সমাজ মানুষের অকল্যাণই বয়ে আনে।

সার-সংক্ষেপ

মানব জীবনে তাকওয়া এক অমূল্য সম্পদ। তাকওয়া, ব্যক্তি মানুষ ও সমাজকে পূত-পবিত্র, পরিচ্ছন্ন ও সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে পারে। পক্ষান্তরে তাকওয়াবিহীন ব্যক্তি ও সমাজ হয় নানা অন্যায় ও পাপের লীলাভূমি। তাই সে সমাজ হয় অশান্তি ও বিশৃঙ্খলায় ভরপুর। তাকওয়াবিহীন ব্যক্তি ও সমাজ মানব সভ্যতার জন্যও মারাত্মক। তাকওয়া না থাকলে মানুষের পার্থিব জীবনে অশান্তি ও পারলৌকিক জীবনে ব্যর্থতা ও শাস্তি ভোগ করতে হবে। এটাই বাস্তবতা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৩.৪

ক. নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন : সঠিক উত্তরটি লিখুন।

১. ইসলামী জীবন দর্শনে তাকওয়া / ধৈর্য / শোকর / সকল সৎগুণের মূল।

২. তাকওয়া অর্থ ভয় করা / ভালবাসা / সত্যবাদিতা।

৩. যিনি তাকওয়া গুণের অধিকারী তিনি মুমিন / মুসলিম মুত্তাকী।

৪. চরিত্র গঠনে তাকওয়া একটি সুদৃঢ় দুর্গ / ঢাল / ধর্ম স্বরূপ।

৫. তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি বেশি মর্যাদাবান, যার মধ্যে বেশি সিদক / তাকওয়া আছে।

খ. সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. তাকওয়ার পরিচয় লিখুন।

২. ব্যক্তিগত জীবনে তাকওয়ার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করুন।

৩. সামাজিক জীবনে তাকওয়ার প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করুন।

পাঠ ৫ সিদক বা সত্যবাদিতা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ পড়ে আপনি-

- সিদক ও কিযব-এর সংজ্ঞা দিতে পারবেন
- সিদকের উপকারিতা ও কিযবের অপকারিতা বর্ণনা করতে পারবেন।

৫.১ সিদক বা সত্যবাদিতার পরিচয়

صِدْقٌ (সিদকুন) অর্থ- সততা, সত্যবাদিতা বা সত্যপ্রিয়তা। যে ব্যক্তির মধ্যে এ মহৎ গুণ রয়েছে, তাঁকে সাদিক صَادِقٌ বা সত্যবাদী বলে। চরম সত্যবাদিকে সিদ্দিক বলা হয়।

كِذْبٌ 'কিযব' অর্থ মিথ্যা, প্রকৃত অবস্থা বা বাস্তবতাকে অস্বীকার করা কিংবা সত্য ঘটনাকে বিকৃত করাকেও কিযব বা মিথ্যা বলা হয়। যে ব্যক্তি মিথ্যা বলে তাকে 'কাযিব' كَاذِبٌ বা মিথ্যাবাদী বলা হয়। এটি মুনাফিকের অন্যতম লক্ষণ এবং অত্যন্ত নিন্দনীয় আচরণ।

সত্যবাদিতা মানবজীবনের একটি অতি মহৎ গুণ। সত্যের মাধ্যমে মানুষ প্রকৃত জীবন লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে। সত্যান্বেষী, সত্যাশ্রয়ী ও সত্য প্রতিষ্ঠাকামী মানুষ ইহকালে সর্বত্র সমাদৃত হন এবং পারলৌকিক জীবনে জান্নাতের পরম সুখ লাভ করবেন। ইসলাম সত্যবাদিতার প্রতি অত্যন্ত বেশি গুরুত্বারোপ করে থাকে। সত্যের বিপরীত মিথ্যা, মানব চরিত্রের সবচেয়ে নিকৃষ্টতম দোষ। মিথ্যা সর্বপ্রকার পাপের মূল। মিথ্যা মানুষকে ধ্বংস করে। ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে মিথ্যার পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। তাই এ থেকে বেঁচে থাকার জন্য চেষ্টা করা কর্তব্য।

৫.২ সত্যবাদিতার উপকারিতা ও মিথ্যার অপকারিতা

ইসলাম সত্য কুফর মিথ্যা :

সত্যবাদিতা, সত্যপ্রিয়তা ও সত্যাশ্রয়ী সম্পর্কে পবিত্র কুরআন-হাদীসে বিশেষভাবে তাকিদ দেয়া হয়েছে। ইসলামকেই সত্য দ্বীন এবং ইসলাম ছাড়া সব কিছুকে মিথ্যা বলা হয়েছে :

اَلْإِسْلَامُ حَقٌّ وَالْكُفْرُ بَاطِلٌ

"ইসলাম সত্য এবং কুফর মিথ্যা।"

জীবনের সকল ক্ষেত্রে সত্যাশ্রয়ী হতে হবে :

ইসলাম মানবকে তার জীবনের পরতে পরতে সত্যাশ্রয়ী হতে বলেছে। কথা-বার্তা, আচার-আচরণ, কাজ-কর্ম তথা জীবনের সর্বত্র সত্যকে আঁকড়ে রাখার জন্য দ্ব্যর্থহীন তাকিদ করেছে। সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য পৃথিবীতে মহান আল্লাহ অগণিত মহামনীষী ও নবী-রাসূলকে প্রেরণ করেছেন। তাঁরা সকলেই জীবনের মূল্য দিয়ে সত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিবেদিত ছিলেন। এ প্রসঙ্গে আল কুরআন বলছে :

هٰذَا يَوْمَ يَنفَعُ الصّٰدِقِيْنَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنّٰتٌ-

"এ তো সেদিন-যেদিন সত্যবাদীগণকে তাদের সত্যবাদিতা বিশেষ উপকার দেবে। তাদের জন্য রয়েছে পরম সুখময় জান্নাত ....।"

কল্যাণময় জীবনের উন্মেষ :

সত্যবাদিতা কল্যাণময় জীবনের উন্মেষ ঘটায়। এ প্রসঙ্গে মহানবী (সা) ঘোষণা করেন :

عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِى إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِى إِلَى الْجَنَّةِ

"তোমাদের কর্তব্য সত্যাশ্রয়ী হওয়া। কেননা, সত্যবাদিতা পুণ্যময় পথের সন্ধান দেয়, আর পুণ্য জান্নাতের পথে চালিত করে।"

সত্য মুক্তি দেয় মিথ্যা ধ্বংস করে : সত্যবাদীকে সকলে ভালবাসে এবং যাবতীয় বিপদে-আপদে সকলে এগিয়ে আসে। সর্বত্র সে সম্মানিত ও আদরণীয় হন। সত্যবাদিতার গুণে মানুষ বিপদ থেকে মুক্তি পায়।
মহানবী (সা) বলেন :

اَلصِّدْقُ يُنْجِيْ وَالْكِذْبُ يُهْلِكُ

"সত্যবাদিতা মানুষকে মুক্তি দেয় এবং মিথ্যা ধ্বংস করে।"

মহানবী (স) মিথ্যার ভয়াবহতা বুঝাতে গিয়ে বলেন : "যখন কোন বান্দা মিথ্যা বলে, তখন তার দুর্গন্ধের কারণে ফেরেশতারা পর্যন্ত তার থেকে এক মাইল দূরে চলে যায়।"

কিযব বা মিথ্যার পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। এ সম্পর্কে মহানবী (স) বলেন :

اِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ فَاِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِى اِلَى الْفُجُوْرِ وَاِنَّ الْفُجُوْرَ يَهْدِى اِلَى النَّارِ

"তোমরা মিথ্যা থেকে বেঁচে থাক। কেননা, মিথ্যা পাপের দিকে নিয়ে যায়, আর পাপ নিয়ে যায় জাহান্নামের দিকে।" –(আল-হাদীস)

মিথ্যা ঘৃণ্যতম অপরাধ

মহানবী (স) সর্বদা মিথ্যাকে ঘৃণা করতেন এবং সাহাবীদের অন্তরে মিথ্যার প্রতি ঘৃণার ভাব জাগিয়ে দিতেন। একদা এক ব্যক্তি মহানবীর (স) কাছে এসে বলল: "হুযুর! আমি চুরি করি, মিথ্যা বলি এবং আরও বহু অন্যায় কাজ করি, এমতাবস্থায় আমি কেমন করে এ সব পাপ কাজ থেকে মুক্তি পাব?" তিনি বললেন– "তুমি শুধু মিথ্যা কথা বলা ছেড়ে দাও।" লোকটি তাই করল এবং দেখা গেল যে, উক্ত মিথ্যা ত্যাগের ফলে লোকটি ক্রমে অন্যান্য সব পাপ কাজও ত্যাগ করতে সক্ষম হল। তার জীবন পাপমুক্ত হলো এবং পরিণামে সে মহৎ ব্যক্তিরূপে পরিচিত হলো।

মিথ্যা প্রধান কবীরাহ গুনাহ

মিথ্যা বলা ও মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা সবচেয়ে বড় কবীরাহ গুনাহ। মহানবী (স) বলেন : "আমি তোমাদেরকে তিনটি বড় কবীরাহ গুনাহের কথা বলছি : (ক) আল্লাহর সাথে শরীক করোনা, (খ) পিতা-মাতার অবাধ্য হয়ো না, (গ) মিথ্যা বলো না এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দিওনা।" (বুখারী-মুসলিম)

মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া মারাত্মক অপরাধ। এটা শিরকের চেয়ে জঘন্য। মহানবী (স) বলেন : "একবার মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া তিনবার শিরক করার সমান অপরাধ।" অপর হাদীসে মহানবী (স) বলেন : "মিথ্যা সাক্ষ্য দাতার ঠিকানা হবে জাহান্নামে।"

সত্য বলা মহৎ গুণ

সত্য বলা, সত্য পথে চলা, সত্যের উপর টিকে থাকা, সত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করা মানব জীবনের মহৎগুণ। সত্যবাদী, সত্যাশ্রয়ী ব্যক্তিকে সবাই ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে। আমাদের প্রিয় নবী (স) শৈশব থেকেই সত্যবাদী ছিলেন, তাই তাঁকে সবাই আস্সাদিক ও আল-আমীন (বিশ্বাসী) বলে সম্মান করত।

সত্যবাদিতা ঈমানের বহিঃপ্রকাশ। মহানবী (স)-এর এক হাদীস থেকে জানা যায়, ঈমানদার ব্যক্তি অন্যান্য পাপ কাজ করলেও তার পক্ষে মিথ্যা বলা এবং প্রতারণা করা সম্ভব নয়। আল্লাহ বলেন :

اِنَّمَا يَفْتَرِى الْكَذِبَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ

"মিথ্যা তারাই বলে, যারা আল্লাহর আয়াতে ঈমান রাখে না।" (সূরা নাহল : ১০৫)

রাসূল (স)-কে এক ব্যক্তি প্রশ্ন করেছিলেন– "মু'মিন কি মিথ্যাবাদী হতে পারে? মহানবী বলেন– না, মু'মিন কখনও মিথ্যাবাদী হতে পারে না। মিথ্যা ও ঈমান একত্রিত হতে পারে না।"

সত্যতা রক্ষা করে চলার যেমন নির্দেশ দেয়া হয়েছে তেমনি সদা সর্বদা সত্যবাদী ও সত্যপরায়ণ লোকদের সঙ্গ অবলম্বন করতে বলা হয়েছে। মু'মিনদের মেলামেশা যেন সত্যপরায়ণদের সঙ্গেই হয়। আল্লাহ আদেশ করেছেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

"হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথী হও।" (তাওবা : ১১৯)

সততায় অমরত্ব মিথ্যায় ব্যর্থতা

এক হাদীসে আছে সততা অবলম্বন কর, যদি এতে তোমার ধ্বংস কিংবা মৃত্যুও আসে। কেননা, সততার মধ্যে নিহিত আছে অমরত্ব ও পরকালের নাজাত। মিথ্যা বলা থেকে বিরত থাক। যদিও এতে বাহ্যিকভাবে সফলতা ও মুক্তি দেখা যায়। কেননা, মিথ্যাচারিতার পরিণাম ধ্বংস ও ব্যর্থতা।

সত্যবাদী লোককে আল্লাহ ও রাসূল ভালবাসেন। সততা আল্লাহ ও রাসূলের ভালবাসা লাভের আসল উপায়। এক হাদীসে আছে : "আল্লাহ ও রাসূলকে ভালবাসতে চাইলে বা আল্লাহ ও রাসূলের ভালবাসা পেতে হলে সত্যবাদী হতে হবে।" (বাইহাকী)

আল্লাহর দরবারে ইবাদত বন্দেগী কবুল হওয়ার পূর্বশর্ত হচ্ছে সত্যবাদিতা। মিথ্যাবাদীর সালাত, সাওম, হাজ্জ, যাকাত কিছুই আল্লাহর দরবারে কবুল হয় না। মহানবী (স) বলেন : "যে ব্যক্তি মিথ্যাচার থেকে বিরত থাকতে পারেনা, তার পানাহার ত্যাগ করায় (সাওমে) আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই।" (বুখারী)

এক হাদীসে এসেছে : "মহানবী (স)-কে জিজ্ঞাসা করা হল– জান্নাতবাসীর চিহ্ন কি? মহানবী বললেন : জান্নাতবাসীর আলামত হল সত্য কথা বলা।" মহানবী (স) অপর এক হাদীসে সত্যবাদিতার জন্য জান্নাতের ওয়াদা করেছেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৩.৫

ক. নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন : সঠিক উত্তরের পাশে টিক দিন।

১. যে ব্যক্তির মধ্যে সত্যবাদিতার গুণ রয়েছে তাকে বলে-
ক. সাদিক খ. কাযিব
গ. সিদ্দিক ঘ. ফাসিক

২. চরম সত্যবাদীকে বলা হয়-
ক. সাদিক খ. সিদ্দিক
গ. সিদ্দিকীন ঘ. মুত্তাকীন

৩. 'কিযব' অর্থ
ক. মিথ্যা খ. প্রকৃত অবস্থা বা বাস্তবতা অস্বীকার করা
গ. সত্য ঘটনাকে বিকৃত করা ঘ. সবকটি।

৪. যে ব্যক্তি মিথ্যা বলে, তাকে বলে-
ক. কাফির খ. নাস্তিক
গ. কাযিব ঘ. সাদিক

৫. সত্যবাদিতার সুফল কি?
ক. মুক্তি খ. ধ্বংস
গ. আর্থিক ক্ষতি ঘ. গ্লানি

৬. মিথ্যা ডেকে আনে-
ক. ধ্বংস খ. মুক্তি
গ. সাফল্য ঘ. উন্নতি

৭. 'মিথ্যা ও ঈমান একত্রিত হতে পারে না"- কার কথা?
ক. আল্লাহর খ. রাসূলের
গ. মহামানবের ঘ. ঈসার।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. 'সিদক' ও 'কিযব' কাকে বলে?
২. সত্যবাদিতার উপকারিতা লিখুন।
৩. মিথ্যাচারের কুফল ও পরিণাম বর্ণনা করুন।

পাঠ ৬ সবর বা ধৈর্য

উদ্দেশ্য

এ পাঠ পড়ে আপনি-

- সবর-এর সংজ্ঞা দিতে পারবেন
- সবরের প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবেন
- সবরের গুরুত্ব ও তাৎপর্য বর্ণনা করতে পারবেন।

৬.১ সবর ধৈর্য-এর পরিচয়

সবর শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো ধৈর্যধারণ করা, সহ্য করা, বারণ থাকা ইত্যাদি। ইসলামী পরিভাষায় সব রকমের বিপদে-আপদে বা পার্থিব কোন বালা-মুসিবতে কিংবা কোন অন্যায়-অত্যাচারে, দুঃখ-কষ্টে, রোগ-শোকে, ক্ষুধা-তৃষ্ঞায় ইত্যাদিতে কোন রূপ বিচলিত না হয়ে মহান স্রষ্টা করুণাময় আল্লাহপাকের উপর নির্ভর করে সবকিছুকে সহ্য করাকেই সবর বা ধৈর্য বলা হয়। এমনি সুখ ও আনন্দ মুখর অবস্থায় কোনরূপ আত্মহারা না হয়ে নির্বিকার চিত্তে সকল কিছুর ভার আল্লাহর উপর ন্যস্ত করে আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশিত পথে অটল অচল হয়ে থাকাকেও ইসলামী পরিভাষায় সবর বলে।

সবর বা ধৈর্য মানব জীবনের একটি মহৎগুণ। ব্যক্তিগত জীবনে ও সামাজিক জীবনে শান্তি ও শৃঙ্খলা, উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য সবর বা ধৈর্যের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। বিপদে-আপদে, বালা-মুসীবতে, সুখে-দুঃখে সর্বাবস্থায় সবরের প্রয়োজন অনস্বীকার্য।

মহানবী (স) বলেন :

اَلصَّبْرُ نِصْفُ الْاِيْمَانِ

"ধৈর্য ঈমানের অর্ধাংশ।"

৬.২ সবরের প্রকারভেদ

ইমাম গাযালী (র) সবরকে পাঁচটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন।

১. সুখ ও আনন্দাবস্থায় ছবর

সুখের সময় মানুষ আনন্দ সাগরে হাবুডুবু খেতে থাকে আর মহান আল্লাহকে ভুলে গিয়ে পাপ পথে পা বাড়ায়। তাই সুখ-স্বাচ্ছন্দের সময় আত্মহারা না হয়ে সবরের মাধ্যমে কু-প্রবৃত্তিকে দমন করে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা কর্তব্য। এজন্যই ইসলামের প্রথম যুগের মনীষীগণ আফসোস করে বলেছেন :

> "আমরা দুঃখ-দারিদ্র্যের অগ্নিপরীক্ষায় সবর করতে পারলেও সুখ-সম্পদের পু   শয্যায় ছবর করতে পারিনি।"

২. বিপদ-মুসিবতে ছবর

মানুষ কখনও রোগ-শোক, জন্ম-মৃত্যু, প্রাকৃতিক দুর্যোগ-মুসীবত, দুঃখ-কষ্ট, ক্ষুধা-তৃষ্ণা, ভয়-ভীতি প্রভৃতি নানা রকম বিপদাপদের সম্মুখীন হয়ে থাকে। আর এসবই তার জন্য পরীক্ষাস্বরূপ। অতএব এ প্রতিকূল অবস্থায় বিচলিত না হয়ে, হা-হুতাশ না করে, বুকে-করাঘাত ও মুখে হায়-হায় রব না করে আল্লাহর মর্জির উপর সন্তুষ্ট থেকে সবর ইখতিয়ার করতে হবে এবং বিপদ সহ্য করার ক্ষমতা দান ও বিপদ দূর করার জন্য আল্লাহর দরবারে দু'আ করতে হবে। এ মর্মে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন : "হে ঈমানদারগণ, তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট সাহায্য কামনা কর। নিশ্চয় তিনি (আল্লাহ) ধৈর্যশীলগণের সাথে আছেন"। (সূরা বাক্বারা)

আর সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহর উপর ভরসা রেখে ধৈর্যধারণ পূর্বক অবস্থার মুকাবিলা করতে হবে এবং বলতে হবে : "নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্য আর তাঁর কাছেই ফিরে যাবো।"

৩. ইবাদতে সবর

আল্লাহ তায়ালা মানবজাতিকে কেবলমাত্র তাঁর ইবাদত বন্দেগীর জন্যই সৃষ্টি করেছেন।

প্রত্যেক প্রকারের ইবাদতেই কিছু না কিছু কষ্ট সহ্য করতে হয়। সুতরাং সকল প্রকার ইবাদত সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে হলে সবরের একান্ত প্রয়োজন।

৪. অত্যাচারে ছবর

সমাজ জীবনে সহনশীলতার অভাব হলে মানুষ একে অপরের উপর যুলুম ও অত্যাচার শুরু করে দেয়। কিন্তু এ যুলুমের ক্ষেত্রে প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষমতা থাকার পরও সামাজিক শান্তির জন্য প্রতিশোধ গ্রহণ না করা হল ছবর। ব্যক্তিগতভাবে এ প্রকার সবর প্রশংসনীয়। তবে অত্যাচারী যেন এতে উৎসাহী হয়ে আরো অত্যাচারে মেতে না উঠতে পারে সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

৫. পাপের কাজে সবর

মানুষের প্রবৃত্তি সদা-সর্বদা অন্যায়-অসত্য ও পাপের প্রতি প্ররোচিত ও প্রলুব্ধ করে। এজন্যই মানুষ পাপের কাজেই খুব আনন্দ পায়। সুতরাং এমতাবস্থায় লোভ-লালসা চরিতার্থ না করে অত্যন্ত সবর ইখতিয়ার করে কু-প্রবৃত্তিকে দমন করতে হয়। অতএব সবর ব্যতীত অন্যকিছুই তাকে পাপময় সংসার থেকে রক্ষা করে অনন্ত শান্তি নিকেতন বেহেশতে পৌঁছাতে পারবে না। তাই মহানবী (স) ঘোষণা করেছেন : "সবর বেহেশতের ভাণ্ডারসমূহের মধ্যে অন্যতম ভাণ্ডার।"

৬.৩ সবরের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

ব্যক্তিগত জীবনে

ব্যক্তিগত জীবনে উন্নতি-অবনতির ক্ষেত্রে সবরের ভূমিকা অপরিসীম। সৎভাবে জীবন যাপন করতে হলে নানবিধ সংগ্রামের মুকাবিলা করতে হয়। কিন্তু অসৎভাবে জীবন শুরু করলে কোন বাধাই থাকে না। সবর না থাকলে কোন অবস্থাতেই কেউ উন্নতি লাভ করতে পারে না। তাই মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন : "হে ঈমানদারগণ! তোমরা সবর কর এবং সবরের ক্ষেত্রে পরস্পরের সাথে প্রতিযোগিতা কর; ছবরের বন্ধনে নিজদিগকে আবদ্ধ কর এবং আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা সাফল্য লাভ করতে পার।" (সূরা আলে ইমরান : ২০০)

সামাজিক পরিমণ্ডলে

সমাজ-সভ্যতাকে সুপথে চালিত করার জন্য প্রত্যেকটি লোকের ধৈর্যশীল হওয়া একান্ত প্রয়োজন। সমাজের অন্যায় অপরাধ রোধে, সকলের প্রতি সুবিচারে, স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, মসজিদ, রাস্তা-ঘাট ইত্যাদি নির্মাণে বহু বাধা বিপত্তি দেখা দিতে পারে, তখন ধৈর্য সহকারে তা সম্পাদন করার মধ্যেই সামাজিক উন্নতি নির্ভর করে। অন্যথা ঝগড়া-ফাসাদ, মামলা-মোকাদ্দমা ও খুন-খারাবীতে সমাজ মহা অশান্তি ও বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে ধ্বংস হতে বাধ্য। তাই মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন :

"নিশ্চয়ই সবরকারীগণকে অগণিত পুরস্কার দেয়া হবে।" (সূরা যুমার : ১০)

রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে

রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও ছবরের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা আরো বেশি। এ ক্ষেত্রে সবর বা ধৈর্যের অভাবে ধ্বংসের মহাযজ্ঞে পরিণত হয় মানব সভ্যতা। বিগত দু'টি বিশ্বযুদ্ধ এবং সাম্প্রতিক বিভিন্ন দেশে সংঘটিত যুদ্ধসমূহ পর্যালোচনা করলে তারই প্রকৃষ্ট উদাহরণ লক্ষ্য করা যায়।

যাবতীয় বিপদাপদ, হিংসা, বিদ্বেষ, চরম উস্কানি, আগ্রাসন জাতিগত হানাহানি প্রভৃতি ক্ষেত্রে জাতি ও আন্তর্জাতিক কর্ণধারগণ যদি অসীম ধৈর্য সহকারে অবস্থার মুকাবিলা করতে পারেন তবেই রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে শান্তির আশা করা যায়।

৬.৪ ধর্মীয় জীবনে

অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় ধর্মীয় জীবনেও সবরের গুরুত্ব সীমাহীন। ধর্মের এমন কোন বিধি বিধান নেই যাতে সবরের প্রয়োজন নেই। যেমন :

ক. আল্লাহর আনুগত্য-ইবাদতে :

মানব সৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্য করা। আর এ ইবাদত ও আনুগত্যে প্রয়োজন অসীম ধৈর্য। কেননা, আল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদত করতে গেলে নিজের প্রবৃত্তি, আত্মীয়-পুত্র-পরিজন, সমাজ, রাষ্ট্র এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ প্রভৃতি থেকে বহু বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়; সে সময় সকল বাধার মুখে অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে আল্লাহর ইবাদতে মশগুল হতে হয়। নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, জিহাদ ও রাত্রি জাগরণ করে আল্লাহর ইবাদত করা চাট্টিখানি কথা নয়- অপরিসীম ধৈর্য না থাকলে এসব কাজ করা মোটেই সম্ভব নয়।

খ. আল্লাহর প্রেম-ভালবাসা লাভে :

যারা বিপদে-আপদে ধৈর্যের সাথে আল্লাহর নির্দেশ মোতাবিক এর মুকাবিলা করে, আল্লাহর প্রেম ও ভালবাসা তাদের মিলে। তাদের জন্যই মহান আল্লাহ বলেছেন : "নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথী" এবং "আল্লাহপাক ধৈর্যশীলগণকে ভালবাসেন।"

গ. উত্তম প্রতিদান লাভে :

ধৈর্যধারণকারীকে আল্লাহ উত্তম এবং অগণিত প্রতিদান দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যেমন– আল্লাহর ঘোষণা : "নিশ্চয় ছবরকারীগণকে অগণিত পুরস্কার দেয়া হবে।" (সূরা যুমার : ১০)

ঘ. আল্লাহর নির্দেশ পালন : বিপদে-আপদে আল্লাহ পাক ধৈর্যধারণ করতে এবং পরস্পর ধৈর্য অনুশীলন করতে নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন -

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা ধৈর্যধারণ কর এবং ধৈর্যধারণে পরস্পর প্রতিযোগিতা কর।" (সূরা আলে ইমরান) "তোমরা পরস্পর ধৈর্যের অনুশীলন কর।" (সূরা-আসর)

ঙ. ঈমানের পূর্ণাঙ্গতায় :

ঈমানের পূর্ণাঙ্গতার জন্য ছবর অপরিহার্য। ঈমানের যত শাখা-প্রশাখা রয়েছে সবর তার মধ্যে অন্যতম। হাদীসে এসেছে "ছবর ঈমানের অর্ধেক।"

চ. জান্নাত লাভে :

যে ব্যক্তি দুঃখ-কষ্টে, বিপদে-আপদে ধৈর্য ধারণ করে আল্লাহর উপর ভরসা করে আল্লাহর নির্দেশ পালন করে চলে সে ধৈর্যের বদলাস্বরূপ পরম কল্যাণ ও জান্নাত লাভে ধন্য হবে। মহানবী (স) সুসংবাদ দিয়ে তাই বলেছেন : "ধৈর্য হলো জান্নাতের ভাণ্ডারসমূহের মধ্যে অন্যতম ভাণ্ডার।" এবং "ধৈর্যের পুরস্কার জান্নাত।"

ছ. সফলতার চাবিকাঠি :

ধৈর্য-যাবতীয় সফলতার চাবিকাঠি। যেমন বলা হয় :

"ধৈর্য প্রশান্তির চাবিকাঠি।" "যে ধৈর্যধারণ করে সে সফলতা লাভ করে।"

সার-সংক্ষেপ
ইসলামের দৃষ্টিতে আল্লাহর নির্দেশ ফরয কাজে ধৈর্যধারণ করা ফরয। অপরাপর বিপদে ধৈর্যধারণ সুন্নাত। তবে শরীয়াত পরিপন্থী কাজে প্রশ্রয় দেয়ার উদ্দেশ্যে ধৈর্য-অন্যায় এবং হারাম কাজে ধৈর্য অবৈধ। অতএব সুখ-আনন্দে এবং বিপদে-মুসিবতে শরী'আত মত ধৈর্য ধারণ করতে হবে। তাহলে মহান আল্লাহর কাছে উত্তম পুরস্কার পাওয়া যাবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৩.৬

ক. নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন : এক কথায় উত্তর দিন।

১. 'সবর' অর্থ কি?
২. 'সবর' ঈমানের কত অংশ।
৩. সুখ ও আনন্দাবস্থায় ছবর কি?
৪. ইবাদতে ছবর কাকে বলে?
৫. পাপ কাজে ছবর মানে কি?

খ. সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. সবরের সংজ্ঞা দিন।
২. সবরের প্রকারভেদ আলোচনা করুন।
৩. সবরের গুরুত্ব ও তাৎপর্য বর্ণনা করুন।
৪. রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সবরের গুরুত্ব লিখুন?
৫. ধর্মীয় জীবনে ছবরের তাৎপর্য বর্ণনা করুন।

পাঠ ৭ যিকর বা আল্লাহর স্মরণ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- যিকরের পরিচয় দিতে পারবেন
- যিকরের গুরুত্ব তুলে ধরতে পারবেন।

৭.১ যিকর-এর পরিচয়

যিকর (ذكر) শব্দের অর্থ হচ্ছে স্মরণ করা। ইসলামী শরীয়াতে স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলার ভয় ও ভালবাসা হৃদয়ে সদা জাগরুক রেখে তাঁরই সন্তুষ্টি অর্জনের ঐকান্তিক কামনায় মন ও মুখে একনিষ্ঠ চিত্তে কথা-বার্তায়, কাজে-কর্মে, আচার-আচরণে, চিন্তা-চেতনায় তথা জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে মহান আল্লাহ পাককে স্মরণ করা ও রাখার নামই যিকর। পরম করুণাময় মহান আল্লাহর সাথে সম্পর্কের জন্য সার্বক্ষণিক যিকর হচ্ছে একটি মৌলিক প্রয়োজন। আল্লাহর নবী (স) সংসার ত্যাগের ধারণা মিশ্রিত যিক্‌রের পরিবর্তে তাঁর উম্মতকে দিবারাতের প্রত্যেকটি কাজের জন্য অসংখ্য দুআ ও যিকর শিখিয়েছেন। এগুলো শয়নে-জাগরণে, চলা-ফেরায়, ওঠা-বসায় তথা প্রত্যেকটি কাজে জারি থাকে। আল্লাহকে ভুলে দুনিয়ার কর্মব্যস্ততার মধ্যে সে কখনও নিজেকে হারিয়ে ফেলে না। যিকর তথা আল্লাহর স্মরণে তার জীবন ভরপুর হয়ে ওঠে। যে যিকরে সচেতন মনের অভিব্যক্তি থাকে না, যার সাথে মানসিক অবস্থার সংযোগ নেই, যা আল্লাহর উপস্থিতির অনুভূতিহীন, যা প্রদর্শনেচ্ছার কলুষমুক্ত এবং নিছক স্নায়ুবিক ব্যায়ামের পর্যায়ভুক্ত। তা থেকে আকাঙ্ক্ষিত ফল লাভ সম্ভব নয়। কাজেই এমন যিকর ইসলামে কাম্য নয়। কেননা, মুখে আল্লাহকে ডাকবে, স্মরণ করবে, অথচ বাস্তব জীবনে আল্লাহর বিধানের বিপরীত কাজ করবে তা আল্লাহ ঘৃণা করেন।

৭.২ যিকরের গুরুত্ব

আল্লাহ এবং বান্দার মধ্যে মহামিলন সূত্র

যিক্‌রের মাধ্যমে পরম করুণাময় আল্লাহ ও তাঁর বান্দার মধ্যে মহামিলনের যোগসূত্র স্থাপিত হয়, এ সময় বান্দার রুহ বা আত্মা আল্লাহর নূর দ্বারা আলোকিত হয় এবং আল্লাহ প্রেমে উজ্জীবিত হয়ে তা অলৌকিক শক্তিতে শক্তিমান হয়ে ওঠে। বান্দা যখন আল্লাহকে স্মরণ করে তখন আল্লাহও তাঁর বান্দাকে স্মরণ করে থাকেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন :

فَاذْكُرُوْنِيْٓ اَذْكُرْكُمْ

"তোমরা আমাকে স্মরণ কর। আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব।" (বাকারা : ১৫২)

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা যামাখশারী বলেন :

فَاذْكُرُوْنِيْ بِالطَّاعَةِ اَذْكُرْكُمْ بِالثَّوَابِ

"তোমরা আমাকে আমার হুকুম আহকাম পালনের মাধ্যমে স্মরণ কর, আর আমি তোমাদেরকে পুরস্কৃত করে স্মরণ করব।"

হাদীসে কুদসীতে এসেছে : আল্লাহ বলেন, "বান্দা যখন আমাকে মনে মনে স্মরণ করে, আমিও তাকে মনে মনে স্মরণ করি, সে যখন আমাকে কোন মজলিসে স্মরণ করে আমি তখন ঐ মজলিসের চেয়ে উত্তম মজলিসে তাকে স্মরণ করি। সে যখন আমার দিকে আধ হাত অগ্রসর হয় আমি তার দিকে এক হাত অগ্রসর হই। সে যখন আমার দিকে হেঁটে আসে, আমি তার দিকে দৌড়ে যাই।"

অপর এক হাদীসে আছে : "এমনি করে বান্দা যখন আমার প্রেমে ডুবে যায়, তখন আমি তার কান হয়ে যাই- যা দ্বারা সে শোনে, আমি তার চোখ হয়ে যাই যা দ্বারা সে দেখে, আমি তার হাত হয়ে যাই যা দ্বারা সে ধরে এবং আমি তার পা হয়ে যাই- যা দ্বারা সে চলে।"

সুতরাং আল্লাহর সাহায্য সহযোগিতা ও তাঁর সাথে সম্পর্ক স্থাপনের প্রধান সূত্র হলো যিকর।

প্রশান্তি লাভের উপায়

মানব জীবনে ধন-দৌলত, রূপ-যৌবন, বিদ্যা-বুদ্ধি, যশ-খ্যাতি প্রভৃতি কোন কিছুই মানব-হৃদয়ে তৃপ্তি ও প্রশান্তি দিতে পারে না। আল্লাহর যিকরই একমাত্র মানসিক প্রশান্তি ও তৃপ্তি লাভের উপায়। কারণ, আল্লাহই হলেন সমস্ত সৃষ্টির একমাত্র কেন্দ্রীয় শক্তি। তাঁরই শক্তি ও কুদরতে নিখিল বিশ্ব ও সমগ্র সৃষ্টি পরিচালিত। সেই মহা শক্তিধর আল্লাহর নিকট হতেই মানবাত্মা আগত। সুতরাং, নদী যেমন তার উৎস সাগরে মিলিত হয়ে শান্তি লাভ করে, তেমনি মানবাত্মাও তার উৎস মহা শক্তিমান আল্লাহর সংগে মিলিত হয়েই চরম শান্তি ও পরম তৃপ্তি লাভ করে। আল্লাহর মহামিলনেই তার মুক্তি ও নাজাত। সুতরাং যিকরের মাধ্যমেই মহান আল্লাহর সংগে মানবাত্মার মিলন ও যোগসূত্র স্থাপিত হয়ে পরিপূর্ণ তৃপ্তি ও প্রশান্তি লাভ করে। এ মর্মে আল্লাহ বলেন :

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

"জেনে রাখ, আল্লাহর স্মরণেই চিত্ত প্রশান্ত হয়।" (সূরা রা'দ : ২৮)

একারণে মানব জীবনে যিকরের গুরুত্ব সর্বাধিক।

কল্যাণকর ইবাদত

সদাসর্বদা আল্লাহকে স্মরণ করা, আল্লাহকে সদা হাযির-নাযির জেনে সার্বক্ষণিকভাবে তাঁর যিকর করা একটি কল্যাণকর ইবাদত। এ মর্মে মহান আল্লাহর বাণী :

তিনি বলেন, وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ "আল্লাহর পাকের যিকরই হলো শ্রেষ্ঠ ইবাদত।" (সূরা আনকাবুত : ৪৫)

আল্লাহ পাক যিকর করার জন্য নির্দেশ প্রদান করে বলেন,

وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"আর তোমরা আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও।" (সূরা জুমুআ)

আল-কুরআনে আরও বলা হয়েছে-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা যখন কোন দলের সম্মুখীন হবে তখন অবিচলিত থাকবে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করবে। যাতে তোমরা সফলকাম হও।" (সূরা আনফাল :৪৫)

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা বেশি বেশি করে আল্লাহর যিকর কর এবং সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা কর।" (সূরা আহযাব : ৪১-৪২)

অন্য আয়াতে এসেছে :

وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً

"তোমার প্রভুকে স্মরণ কর অনুচ্চ স্বরে মনে মনে বিনীতভাবে ও মশংকচিত্তে।" (আরাফ : ২০৫)

মনের কালিমা দূর করে

মানুষ জন্মগতভাবেই দুর্বলতা ও ভুলত্রুটি দ্বারা প্রভাবিত। কু-প্রবৃত্তি ও শয়তানের প্ররোচনায় এবং লোভ-লালসা ও হিংসা-বিদ্বেষের কারণে মানুষ নানারূপ অন্যায়, অপকর্ম ও পাপ কার্যে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে। এতে তার স্বচ্ছ হৃদয়ে কালিমা বা দাগ পড়তে থাকে। হাদীসের ভাষ্যানুযায়ী দেখা যায়– "মানুষ যখন কোন পাপ কাজ করে তখন তার অন্তরাত্মায় একটি কালো দাগ পড়ে এবং পাপের কাজ করতে করতে তার সমস্ত অন্তর কালিমাযুক্ত হয়ে যায়। যিকর ছাড়া অন্তরের সেই কালো দাগ দূর করার কোন উপায় নেই। এ মর্মে মহানবী (স) ঘোষণা করেন,

لِكُلِّ شَيْءٍ صِقَالَةٌ وَصِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ

"প্রত্যেক বস্তুর জন্যই মরিচা তোলার যন্ত্র আছে, আর অন্তরের মরিচা দূর করার যন্ত্র হলো আল্লাহর যিকর।" (বায়হাকী)

শয়তান বিতাড়নের উপায় :

শয়তান মানুষের আজন্ম-দুশমন। মানুষকে আল্লাহর নাফরমানিতে লিপ্ত করে দোযখে তার সংগী করাই হলো তার সমস্ত কর্মতৎপরতার মূল লক্ষ্য। শয়তান মানুষকে বিভ্রান্ত ও বিপথগামী করার জন্য সমস্ত শক্তি দিয়ে প্রচেষ্টা চালায়। কিন্তু মানুষ যখন আল্লাহর যিক্‌রে মশগুল থাকে তখন সে পলায়ন করতে বাধ্য হয়। এ প্রসঙ্গে মহানবী (স) বলেন :

اَلشَّيْطَانُ جَاثِمٌ عَلٰى قَلْبِ ابْنِ اٰدَمَ فَاِذَا ذَكَرَ اللّٰهَ خَنَسَ وَاِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ

"শয়তান আদম সন্তানের অন্তরে হাঁটু গেড়ে বসে থাকে। অতপর যখন মানুষ আল্লাহর যিকর করে, তখন শয়তান পালিয়ে যায়। আর যখন মানুষ আল্লাহর যিকর থেকে গাফেল হয়, তখন শয়তান তাকে কুমন্ত্রণা দেয়।" (বুখারী)

জান্নাতের সওগাত

আল্লাহর যিকর উত্তম ইবাদত। আল্লাহর যিক্‌রের মাহফিল উত্তম ও পবিত্র জলসা। যিকর মাহফিলকে মহানবী (স) বেহেশতের উদ্যানের সাথে তুলনা করে বলেছেন, "যখন তোমরা জান্নাতের উদ্যানের পাশ দিয়ে অতিক্রম কর, তখন এর ফল ভোগ করো। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করেন, জান্নাতের উদ্যান কি? তিনি উত্তরে বলেন, যিক্‌রের মাহফিল।" এ থেকে বুঝা যায় যে, যিক্‌রের গুরুত্ব ও ফযীলত কতখানি তাৎপর্যময়। আল্লাহর স্মরণ মানুষের অন্তরাত্মাকে সঞ্জীবিত রাখে। যে অন্তর আল্লাহর স্মরণশূন্য সে অন্তর মৃত। এদিকে ইংগিত করে মহানবী (স) বলেন :

مَثَلُ الَّذِىْ يَذْكُرُ اللّٰهَ رَبَّهٗ وَالَّذِىْ لَا يَذْكُر كَمَثَلِ الْحَىِّ وَالْمَيِّتِ

"যে ব্যক্তি তার প্রভু আল্লাহর স্মরণ করে, আর যে ব্যক্তি স্মরণ করে না, তাদের দৃষ্টান্ত হবে জীবিত ও মৃতের ন্যায়।" (বুখারী-মুসলিম)

আল্লাহর কে ভুলে যাওয়া ধ্বংস ডেকে আনে

আল্লাহকে ভুলে যাওয়া, তার স্মরণ হতে বিরত থাকা ধ্বংসেরই নামান্তর। আল্লাহর যিকর থেকে বিরত থাকলে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন। দুনিয়া ও আখিরাতে ধ্বংস হয় অনিবার্য। আল্লাহকে ভুলে গেলে ইহকালে নেমে আসে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা। আর পরকালেও পেতে হবে জাহান্নামের চরম শাস্তি। যে ব্যক্তি বা জাতি আল্লাহর যিকর থেকে বিরত থাকে তার বা তাদের জন্য দুনিয়ার জীবন জীবিকা সংকীর্ণ ও বাধাগ্রস্ত হবে। পরলোকে অন্ধ, দিশেহারা ও পথহারা হয়ে দোযখে যাবে। আল্লাহর ঘোষণা :

وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِىْ فَاِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَّنَحْشُرُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَعْمٰى

"যে ব্যক্তি আমার যিকর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার জীবিকা অবশ্যই সংকীর্ণ হয়ে যাবে। কিয়ামতের দিবসে তাকে অন্ধ করে উঠানো হবে। (সূরা ত্বা-হা : ১২৪)

আল্লাহ আরও বলেন :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَآ اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ

"হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ এবং সন্তানাদি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে বিরত না রাখে। যারা এরূপ করে তারা ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবে।" (সূরা মুনাফিকুন : ৯)

যিকর হতে হবে সার্বক্ষণিক

আল্লাহকে স্মরণ রাখতে হবে সদা সর্বদা। তাঁর যিকর করতে হবে সার্বক্ষণিক। কখনই আল্লাহকে ভুলে যাওয়া ঠিক নয়। শয়নে স্বপনে, জাগরণে, প্রতিটি মুহূর্তে প্রতিটি কাজে প্রতিটি সময়েই আল্লাহকে স্মরণ করতে হবে। মুমিন হৃদয় কখনও আল্লাহর স্মরণশূন্য থাকে না। এমর্মে আল্লাহ বলেন :

فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيَامًا وَّ قُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِكُمْ

"তোমরা আল্লাহকে স্মরণ কর, দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে।" (সূরা নিসা)

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৩.৭

ক. নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন : এক কথায় উত্তর দিন।

১. 'যিকর' এর অর্থ কি?

২. আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে মহামিলন সূত্র কী?

৩. আল্লাহকে স্মরণ করলে, আল্লাহ তাআলা কি করবেন বলে উল্লেখ করেছেন?

৪. মানবাত্মার প্রশান্তি লাভ করে কিসের মাধ্যমে?

৫. অন্তরের মরিচা দূর করার যন্ত্র কী?

৬. আল্লাহর স্মরণশূন্য অন্তর কেমন?

৭. যে ব্যক্তি আল্লাহর স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়- তার কী পরিণাম হবে?

খ. সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. যিকরের পরিচয় দিন।

২. যিকরের তাৎপর্য লিখুন।

৩. যিকরের গুরুত্ব বর্ণনা করুন।

৪. "আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে মহামিলন সূত্র যিকর'- ব্যাখ্যা করুন।

৫. আল্লাহকে স্মরণ না করার পরিনাম কী? লিখুন।

পাঠ ৮ শোকর বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- শোকরের পরিচয় দিতে পারবেন
- শোকরের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- শোকরের প্রকারভেদ উল্লেখ করতে পারবেন
- শোকরের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারবেন।

৮.১ শোকর এর পরিচয়

শোকর (شكر) শব্দের অর্থ হচ্ছে : কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। প্রচলিত অর্থে কারো অনুগ্রহ ও অনুদান ভোগ-ব্যবহার করার পর দাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তার দান স্বীকার করা। শরীয়াতের পরিভাষায়- মহান আল্লাহর অফুরন্ত নিয়ামত ভোগ-ব্যবহারের পর সন্তুষ্ট হৃদয়ে, বিনয় ও বিনম্রতার সাথে তাঁর ভালবাসা ও রেজামন্দি লাভের মানসে, কথায় ও কাজে এবং বাস্তব জীবনে তাঁরই মর্জি মুতাবিক কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করাকেই শোকর বলা হয়। মানুষ মহান আল্লাহর অফুরন্ত নিয়ামতরাজির মাঝে ডুবে আছে। আল্লাহ বলেন-

وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا

'যদি আল্লাহর নিয়ামত গণনা কর তাহলে তা গুনে শেষ করতে পারবে না।" (সূরা ইবরাহীম : ৩৪)

৮.২ শোকর-এর তাৎপর্য

ইসলামী আখলাকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য শোকর। শোকর মানবের ব্যক্তি চরিত্রকে মহিমান্বিত ও সুষমামণ্ডিত করে। এটা মানবীয় উত্তম গুণাবলীর মধ্যে অন্যতম। শোকরের মাধ্যমে মুমিনের হৃদয়ে আল্লাহর সমীপে সমর্পণের চেতনা জাগ্রত করে। আল্লাহ মানুষকে যা কিছু অনুগ্রহ দান করেছেন সেজন্য সকল অবস্থায় আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং তার প্রশংসা করা মুমিন হৃদয়ের পরিচয় বহন করে। নাশোকরি বা অকৃতজ্ঞতা বিদ্রোহ তথা কুফরির শামিল। মুমিন কখনো তা করতে পারে না। সে যে অবস্থায়ই থাকুক না কেন, সেজন্য সে সব সময় সুখী, আল্লাহর কাজে কৃতজ্ঞ ও আনতচিত্ত। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন :

وَاٰخِرُ دَعْوٰىهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

"তাদের সকল কথার শেষ কথা- সকল প্রশংসা একমাত্র নিখিল বিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহর জন্যেই।" (সূরা ইউনুস : ১০)

মানবের প্রতি সে অগণিত নিয়ামতের সীমা সংখ্যা নেই। মানব দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং নিটোল গঠনের প্রতি অবলোকন করলে প্রতিটি জিনিসে আল্লাহর নিয়ামত লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া জীবন ধারণের জন্য জগতের যাবতীয় সৃষ্টি মানব কল্যাণে নিয়োজিত। এটা আরো বিশালায়তন নিয়ামতের অন্তর্ভুক্ত। এছাড়াও প্রতিনিয়ত অসংখ্য নিয়ামত বর্ষিত হচ্ছে। মহান আল্লাহর এ সমুদয় নিয়ামত ভোগ ব্যবহার করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তাঁরই সমীপে আনত শিরে সেগুলোর সদ্ব্যবহার করাই প্রকৃত শোকর।

নিয়ামতের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও হাকীকত বুঝতে হবে। তা নাহলে তার সঠিক ব্যবহার করা যাবে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়- চোখ ও কান এ দুটো অঙ্গ দর্শন ও শ্রবণের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। সুতরাং চোখ ও কান দ্বারা এমন বস্তু ও কথা দেখতে ও শুনতে হবে যা দেখা ও শোনা আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন। এমন কোন বস্তু দেখা ও শোনার কাজে এগুলো ব্যবহার করা যাবে না- যা আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন না। এমনিভাবে হাত, জিহ্বা, পা, রূপ, যৌবন, বিদ্যা, বুদ্ধি-বিবেক, মান-সম্মান, প্রভাব-প্রতিপত্তি, ধন, ঐশ্বর্য, পদমর্যাদা, ইত্যাদি নিয়ামতকে আল্লাহর পছন্দনীয় কাজে ব্যবহার করতে হবে। তা হলেই এসব নিয়ামতের শোকর আদায় হবে। একেই বলা হয় শোকর বিষয়ক আমল বা কাজ। আর এটাই হল আসল শোকর।

৮.৩ শোকরের প্রকারভেদ

সুখ ও দুঃখ মানব জীবনে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই এ দু'অবস্থায় শোকরকে দু'প্রকারে ভাগ করা যায়।

১. সুখের অবস্থায় শোকর

সুখ স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন-যাপনের জন্য আল্লাহ মানুষকে অগণিত উপায়-উপাদান দান করেছেন। তাই মহান আল্লাহর শোকর গুজারি একান্ত অপরিহার্য। সফলতায় ও বিজয়ের আনন্দে আত্মহারা ও অহংকারী হওয়া উচিত নয়। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এটা নিজের কোন বাহাদুরি নয়। এগুলো অর্জনের বিষয়ে মানুষের নিজের কোন কৃতিত্ব নেই। অবশ্য দেখা যায় সুখের সময়ে মানুষ আল্লাহকে ভুলে যায়। কিন্তু এ সময়ে আল্লাহকে ভুলে যাওয়া উচিত হবে না। বরং সুখ-স্বাচ্ছন্দের জন্য আনন্দচিত্তে অতিশয় বিনয় ও নম্রতার সাথে বেশি বেশি আল্লাহর শোকর আদায় করতে হবে। শোকর আদায়ের বাস্তব নমুনা পেশের জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে তারই নির্দেশ মোতাবেক সে সব নিয়ামতের ভোগ-ব্যবহার করতে হবে। আল্লাহর নিয়ামতের এভাবে ব্যবহার করাকেই সুখের অবস্থায় শোকর বলা হয়। মক্কা বিজয়ের দিন মহানবী (স) বিজয়ের আনন্দে আত্মহারা না হয়ে এবং ক্ষমতা পেয়েও শত্রুদের শাস্তি না দিয়ে তিনি আল্লাহর শোকর আদায় করেছিলেন। এভাবে তিনি শত্রুদের ক্ষমা করে। কৃতজ্ঞতাভরে আল্লাহর সমীপে সাজদায় অবনত হলেন।

২. দুঃখের অবস্থায় শোকর

পার্থিব জীবনের সুখের পাশাপাশি দুঃখ, কষ্ট, বিপদ ও মুসীবতও মানব জীবনের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। আল্লাহ বলেন,

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝

"নিশ্চয়ই দুঃখের সাথে সুখ অবধারিত এবং অবশ্যই দুঃখের পরে সুখ আছে।" (সূরা ইনশিরাহ : ৫,৬)

দুঃখ ও বিপদের সময় শোকর করার অর্থ হল বালা মুসীবতের প্রকোপে আল্লাহর প্রতি বিরক্তিভাব পোষণ না করে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করা এবং অস্থিরতা প্রকাশ না করে অবিচলিত মনে আল্লাহকে স্মরণ করা। এ সময়ে এ ধারণা পোষণ করতে হবে যে, বালা মুসীবত চিরস্থায়ী নয়। দুঃখের পরেই সুখ আসে। সুতরাং দুঃখকে পরবর্তী সুখের বার্তাবাহক মনে করতে হবে। আর যত বড়ই মুসিবত হোক না কেন তা অপরের তুলনায় চিন্তা করলে কমই মনে করে সর্বাবস্থায় ধৈর্যধারণ করে আল্লাহর শোকর আদায় করা উচিৎ। কেননা মুমিনগণ দুঃখ-বেদনা ও সুখ-শান্তি উভয়কেই আল্লাহর নি'আমত মনে করেন।

আল্লাহর নবী (স) মুমিনদের পরিচয় তুলে ধরে বলেন :

إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شُكْرٌ - وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبْرٌ

"ঈমানদার ব্যক্তির লক্ষণ হল- সে সুখে থাকলে শোকর আদায় করে এবং বিপদে পড়লে ছবর করে।" (মুসলিম)

সুতরাং যতই দুঃখ বেদনা আসুক তা হাসিমুখে বরণ করে নিতে হবে। মুখে বলতে হবে :

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ "আমরা আল্লাহর জন্য আর তারই দিকে আমরা ফিরে যাব।"

৮.৪ শোকরের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

জীবনে শোকরের গুরুত্ব অপরিসীম। শোকরের গুরুত্বের কয়েকটি দিক এখানে তুলে ধরা হলো।

নি'আমত বৃদ্ধিতে

মানুষ আল্লাহ তা'আলার নি'আমত ভোগ করার পর যদি শোকর আদায় করে, তাহলে আল্লাহ তার জন্য নি'আমত আরো বাড়িয়ে দেন। এ মর্মে আল্লাহ ঘোষণা করেন- لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ "তোমরা যদি শোকর কর, অবশ্যই আমি তোমাদের নি'আমত বাড়িয়ে দেবো।" - (সূরা ইব্‌রাহীম : ৭)

তিনি আরো বলেন-

وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ

"যে ব্যক্তি শোকর করে, সে তার নিজের জন্যই তা করে।" -(সূরা নাহ্‌ল : ৪০)

শাস্তি থেকে পরিত্রাণ

আর আল্লাহ তা'আলার নি'আমত ভোগ করার পর মানুষ যদি তাঁর শোকর আদায় না করে, তবে তিনি কঠিন ও নির্মম শাস্তি দিয়ে থাকেন। যেমন, আল্লাহ বলেন-وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ "আর যদি তোমরা শোকর আদায় না কর, তবে জেনে রেখো, আমার শাস্তি বড়ই কঠিন।"-(সূরা ইব্‌রাহীম : ৭)

কাজেই নি'আমত ভোগ করার পর শোকর আদায় করা একান্ত অপরিহার্য।

সম্মান লাভে

আল্লাহ তা'আলা শোকর আদায়কারীর সম্মান দিয়ে থাকেন। এ মর্মে মহানবী (স) বলেন-

اَلطَّاعِمُ الشَّاكِرُ بِمَنْزِلَةِ الصَّائِمِ الصَّابِرِ

"যে ব্যক্তি পানাহার করে শোকর করে তার মর্যাদা ধৈর্যশীল রোযাদারের মত।" -বুখারী

যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার ইবাদতের পূর্ণতা ও কবুল হওয়ার জন্য শোকর আদায় করে, আল্লাহ তাকে অশেষ পুরস্কার দান করবেন। এমর্মে আল্লাহর ঘোষণা- وَسَيَجْزِى اللّٰهُ الشّٰكِرِيْنَ "অচিরেই আল্লাহ তা'আলা শোকর আদায়কারীদের পুরস্কার দেবেন।" -(সূরা আলে ইমরান : ১৪৪)

ইবাদতের পূর্ণতায়

শোকর আদায় করাও আল্লাহ তা'আলার ইবাদাত। ইবাদাতের পূর্ণতা ও কবুল হওয়ার জন্য শোকর আদায় করা অপরিহার্য। মহান আল্লাহ পাক বলেন-

وَاشْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ

"তোমরা যদি কেবল আল্লাহর বন্দেগী করতে চাও, তাহলে তাঁর নিয়ামতের শোকর কর।" -(সূরা নাহ্‌ল : ১১৪)

ঈমানকে মজবুত ও অক্ষুণ্ন রাখতে হলে শোকর আদায় করা একান্ত প্রয়োজন। শোকর আদায় করা ঈমানদারের লক্ষণ। এ সম্পর্কে নবী করীম (স) বলেন-

اِنْ اَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شُكْرٌ- وَاِنْ اَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبْرٌ

'ঈমানদার ব্যক্তির লক্ষণ হলো, যখন সে সুখে থাকে, শোকর করে। আর যখন সে কষ্টে পড়ে, তখন ধৈর্য্য ধারণ করে।' -(মুসলিম)

মানুষে মানুষে সম্প্রীতি স্থাপনে

মানুষ মানুষের দ্বারা অনেক উপকার পেয়ে থাকে। সেসব উপকারের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলে পরস্পরের সম্প্রীতি সৃষ্টি হয় এবং শত্রুতা দূর হয়। এ মর্মে মহানবী (স) বলেন-

مَنْ لَمْ يَشْكُرُ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللهَ-

"যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞ নয়, সে আল্লাহর প্রতিও কৃতজ্ঞ নয়।" -(তিরমিযী)

কাজেই মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকারান্তরে আল্লাহরই শোকর করার শামিল।

মানুষ আল্লাহর অগণিত নিয়ামতের মধ্যে ডুবে আছে। আল্লাহ বান্দাকে তাঁর নিয়ামতের শোকর আদায়ের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। এ নির্দেশ পালনের জন্যই আল্লাহর শোকর আদায় করতে হবে। যেমন মহান আল্লাহর ঘোষণা :

فَاذْكُرُوْنِىْٓ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْا لِىْ وَلَا تَكْفُرُوْنِ

"তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদের স্মরণ করব এবং আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর এবং অকৃতজ্ঞ হয়ো না।' (সূরা বাকারা : ১৫২)

كُلُوْا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوالَهٗ

"তোমরা তোমাদের প্রভুর দেয়া রিযক উপভোগ কর আর এর জন্য তাঁর শোকর আদায় কর।"

আল্লাহর নবী (স) বলেন :

"তুমি অবশ্যই আল্লাহর শোকর আদায় কর, কেননা, আমাদের জীবন, আমাদের ধন-সম্পদ ও আমাদের পরিবার-পরিজন সবকিছুই আল্লাহ তা'আলার সুমধুর দান এবং আমাদের নিকট তাঁর গচ্ছিত আমানত।"

এসব বর্ণনা থেকে সহজেই বুঝা যায় যে মানুষের ব্যক্তিগত ও সমাজ জীবনে শোকরের গুরুত্ব খুবই ব্যাপক।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৩.৮

ক. নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন : সত্য মিথ্যা নির্ণয় করুন।

১. শোকর অর্থ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ।
২. না-শোকরি বা অকৃতজ্ঞতা বিদ্রোহ তথা কুফরির শামিল।
৩. সফলতা ও বিজয়ের আনন্দে আত্মহারা ও অহংকারী হওয়া উচিত।
৪. মুমিনগণ দুঃখ-বেদনা ও সুখ-শান্তি উভয়কেই আল্লাহর নিআমত মনে করেন।
৫. মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলে শত্রুতা সৃষ্টি হয়।

খ. সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. শোকরের পরিচয় দিন।
২. শোকরের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।
৩. শোকরের প্রকারভেদ বর্ণনা করুন।
৪. শোকরের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করুন।

পাঠ ৯ কর্তব্য পরায়ণতা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- কর্তব্য পরায়ণতা কি তা বলতে পারবেন
- কর্তব্য পরায়ণতার গুরুত্ব তুলে ধরতে পারবেন
- কর্তব্য পরায়ণতার ক্ষেত্রসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন
- কর্তব্য পরায়ণতার অবহেলার পরিণাম উল্লেখ করতে পারবেন।

৯.১ কর্তব্যপরায়ণতা

কর্তব্য অর্থ করণীয়, দায়িত্ব, যা করতে হবে। যেসব দায়িত্ব পালন করা বা যেসব কাজ করা আমাদের অপরিহার্য, তাকে কর্তব্য বলে। আমাদের জীবন হচ্ছে কতকগুলো কাজের সমষ্টি। যার উপর যে কাজের দায়িত্বভার থাকে, তা পালন করা হচ্ছে তার কর্তব্য। যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করাকে বলা হয় কর্তব্যপরায়ণতা। অর্থাৎ, যার উপর যতটুকু দায়িত্ব-কর্তব্য আছে, তা আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও জবাবদিহিতার অনুভূতি নিয়ে সুষ্ঠু সুচারুরূপে পালন করার নামই কর্তব্যপরায়ণতা। আরও ব্যাপকভাবে বলা যায়- মানুষ হিসেবে স্রষ্টার জন্যে, মানুষের জন্য এবং সৃষ্টির জন্য যা কিছু কল্যাণকর তা করার নাম কর্তব্যপরায়ণতা। মানুষ আশরাফুল মাখ্‌লুকাত বা সৃষ্টির সেরা জীব। মানুষকে আল্লাহর খিলাফত বা প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব-কর্তব্য আঞ্জাম দেয়ার জন্যই এ মাটির পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়েছে। পৃথিবীতে মানুষের কর্তব্য ও দায়িত্বের সীমা-পরিসীমা নেই। তবে সব কর্তব্য একজন মানুষ পালন করতে পারে না। যার উপর যতটুকু দায়িত্ব-কর্তব্য আছে তা আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও জবাবদিহিতার অনুভূতি নিয়ে পালন করার নামই কর্তব্যপরায়ণতা।

৯.২ কর্তব্যপরায়ণতার ক্ষেত্র

আমাদের যাবতীয় দায়িত্ব কর্তব্যকে দুভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

১. স্রষ্টার প্রতি কর্তব্য :

যাকে হাককুল্লাহ বলা হয়। এ পর্যায়ে আল্লাহ তা'আলা যেসব ইবাদত-বন্দেগীর কথা বলেছেন, তা যথাযথভাবে পালন করলে এক্ষেত্রের কর্তব্য পালন হয়।

২. সৃষ্টির প্রতি কর্তব্য :

একে হাককুল ইবাদ বলা হয়। আল্লাহর ইবাদত পালনের মাধ্যমে সৃষ্টির প্রতি কর্তব্য পালন হয়। তাছাড়া মানুষ ও সৃষ্টিকুলের কল্যাণ ও সেবার মাধ্যমে তা করা যায়। এটাও ইবাদতের অংশ।

৯.৩ কর্তব্যপরায়ণতার ক্ষেত্রসমূহ

মানুষ সামাজিক জীব। ব্যক্তি, পরিবার থেকে শুরু করে সমাজ, রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক পর্যায় পর্যন্ত প্রতিটি স্তরেই আমাদের দায়িত্ব-কর্তব্য রয়েছে। এসব দায়িত্ব কর্তব্য নিষ্ঠাসহ ও সুষ্ঠুভাবে পালনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

এ ব্যাপারে মহানবীর (স) একটি হাদীস খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মহানবী (স) ঘোষণা করেন :

اَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

"সাবধান ! তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। আর তোমাদের প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব সম্বন্ধে জবাবদিহি করতে হবে।" (বুখারী-মুসলিম) কর্তব্য পরায়ণতার ক্ষেত্রগুলো নিম্নরূপ-

নিজের প্রতি কর্তব্য

নিজের প্রতি কর্তব্যপরায়ণতার প্রয়োজন সর্বাগ্রে। কেননা, নিজেকে সুযোগ্য করে গড়ে না তুললে অন্যের প্রতি কর্তব্য পালন করা যায় না। মহানবী (স) বলেছেন,

لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ

"তোমার নিজের প্রতি তোমার কর্তব্য আছে" (বুখারী)। যথা নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন নেয়া, নিয়মিত পানাহার করা, লেখাপড়া করে নিজেকে যোগ্য করে গড়ে তোলা, হালাল উপার্জনের মাধ্যমে নিজেকে সক্ষম, স্বচ্ছল ও আত্মনির্ভরশীল করে

গড়ে তোলা। আর নিজেকে সৎ, যোগ্য, সুন্দর করে আল্লাহর খাঁটি বান্দা হিসেবে গড়ে তোলা বড় কর্তব্যপরায়ণতা। তা না হলে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে।

নিজ সন্তানের প্রতি কর্তব্য

সন্তানকে যোগ্য মানুষ ও যোগ্য বান্দা হিসেবে গড়ে তোলা পিতামাতার কর্তব্য। এছাড়া সন্তানকে দৈহিক ও মানসিকভাবে সুস্থ-সবল করে গড়ে তোলা, যত্নের সাথে লালনপালন করা, সুশিক্ষার ব্যবস্থা করা সততা, সত্যবাদিতা, উদারতা ইত্যাদি গুণের অধিকারী করে গড়ে তোলা খুবই জরুরী। এ সব ব্যাপারে অবহেলা করলে ভবিষ্যত মানব সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যাবে।

পিতামাতার প্রতি কর্তব্য

পিতা-মাতার প্রতি কর্তব্য পালন করার গুরুত্ব আল্লাহর ইবাদতের পরেই। পিতামাতাকে মান্য করা, তাঁদের জীবন-যাপনে সাহায্য করা, ভক্তি শ্রদ্ধা করা সন্তানের কর্তব্য।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا

"তোমরা পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার কর।" (সূরা বনী ইসরাঈল : ২৩)

স্বামী-স্ত্রীর প্রতি কর্তব্য

স্বামী-স্ত্রীর একে অন্যের প্রতি কর্তব্য পালন করতে হয়। সুবিধা-অসুবিধার প্রতি দৃষ্টি সচেতন থাকা। স্ত্রীর কর্তব্য অনুগত থেকে মনপ্রাণ উজাড় করে স্বামীর খেদমত করা। আর স্বামীর কর্তব্য হল স্নেহ, সোহাগ দিয়ে স্ত্রীকে আপন করে নেয়া।

ছোটদের প্রতি

ছোটদের প্রতি আদর-স্নেহ করা বড়দের কর্তব্য। মহানবী (স) বলেন, "যে ছোটদের স্নেহ করেনা এবং বড়দের সম্মান করেনা, সে আমাদের (মুসলিমদের) সমাজভুক্ত নয়।" (আবূ দাউদ) ছোটদেরকে যোগ্য মানুষ হিসেবে গড়ে তোলাই হল বড়দের কর্তব্য। ছোটরা বড়দের অনুকরণ করে, তাই বড়দেরকে আদর্শ হিসেবে পেশ করা কর্তব্য।

বড়দের প্রতি সম্মান

ছোটদের যেমন স্নেহ করতে হয়, তেমনি বড়দের সম্মান করতে হয়। মহানবী (স) বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোন বৃদ্ধকে তাঁর বয়সের জন্য সম্মান করে, আল্লাহ তা'আলা অন্যের দ্বারা তাঁর সম্মান করাবেন। (আবূ দাউদ) তিনি বড়দের খুব সম্মান করতেন। যে সমাজে বড়দের সম্মান ওঠে যায়, বড়দের কদর করা না হয়, সে সমাজের ধ্বংস অনিবার্য।

আত্মীয়-স্বজনের প্রতি কর্তব্য

আত্মীয়-স্বজনের প্রতি রয়েছে মানুষের অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য। তা সুষ্ঠুভাবে পালন করা একান্ত দরকার। মহানবী (স) বলেন:

لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعُ رِحْمٍ

"আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।" (বুখারী, মুসলিম)

গরীব আত্মীয়-স্বজনের খোঁজ-খবর নেয়া, তাদের পাশে দাঁড়ান, সাহায্য-সহযোগিতা করা অবশ্য করণীয় কাজ।

পাড়া-প্রতিবেশীর প্রতি কর্তব্য

পাড়া-প্রতিবেশীদের প্রতি অনেক দায়িত্ব কর্তব্য আছে। প্রতিবেশীর সাথে ভাল ব্যবহার, বিপদাপদে তাঁদের পাশে দাঁড়ানো একান্ত কর্তব্য। মহানবী (স) বলেছেন, "যে পেটভরে খায় এবং তার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত অবস্থায় রাত যাপন করে, সে ব্যক্তি আমার প্রতি ঈমান আনেনি।" (দায়লামী)

দুঃস্থ মানবতার প্রতি

অসহায়, দুঃস্থ মানবতার প্রতি আমাদের অনেক দায়িত্ব কর্তব্য আছে। তাদের সব রকম সাহায্য সহায়তা দান করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য। মহানবী (স) বলেছেন, "তোমরা পৃথিবীবাসীদের প্রতি সদয় ব্যবহার কর, তা হলে যিনি আসমানে আছেন (আল্লাহ) তিনি তোমাদের দয়া করবেন।" (তিরমিযী)

সৃষ্টি জীবের প্রতি

মানুষ আশরাফুল মাখলূকাত-সৃষ্টি জগতের সেরা। তাই অন্যান্য সৃষ্টি- জীবজন্তু, পশু-পাখি, গাছ-পালা এদের সবার প্রতি মানুষের কর্তব্য রয়েছে। সৃষ্টির প্রতি অবহেলা করলে, সৃষ্টিকর্তা অসন্তুষ্ট হন। মহানবী (স) বলেছেন :

اَلْخَلْقُ عِيَالُ اللهِ فَاَحَبُّ الْخَلْقَ اِلَى اللهِ مَنْ اَحْسَنَ اِلَى عِيَالِهٖ

"সমগ্র সৃষ্টি আল্লাহ পরিজন, সুতরাং সকল সৃষ্টির মধ্যে সে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয়, যে তাঁর সৃষ্টির প্রতি বেশি অনুগ্রহশীল।" (বায়হাকী)

সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা

সমাজ জীবনের সর্বক্ষেত্রে সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা সাধনা করা মানুষের অবশ্য কর্তব্যের মধ্যে পড়ে।

সমাজ থেকে যাবতীয় অন্যায়-অসত্যকে দূরীভূত করার জন্য মানুষকে সংগ্রাম করতে হবে। প্রাণপণ চেষ্টা সাধনা করতে হবে। মহানবী (স) বলেন : "যখন তোমরা সমাজে কোন অন্যায় কাজ দেখ, তখন তা শক্তি দিয়ে প্রতিরোধ কর, শক্তি না থাকলে মুখে বল। তাও না পারলে অন্তর দিয়ে ঘৃণা কর। আর এটা হল দুর্বল ঈমানের লক্ষণ।"

দেশের প্রতি

স্বদেশ প্রেম ঈমানের অঙ্গ। যেমন বলা হয়েছে- حُبُّ الْوَطَنِ مِنَ الْإِيْمَانِ

"স্বদেশ প্রেম ঈমানের অঙ্গ।"

প্রয়োজন হলে দেশের জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকতে হয়।

মানুষের আন্তর্জাতিক কর্তব্যও আছে। অসাম্প্রদায়িক মনোভাব নিয়ে সকল জাতির প্রতি মানবিক আচরণ করা প্রতিটি মানবগোষ্ঠীর প্রয়োজন। অন্যায়ভাবে কোন জাতিকে কষ্ট দেয়া, কোন দেশের প্রতি যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া খুবই অন্যায়। এসব ক্ষেত্রে শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য কাজ করে যাওয়া অবশ্যই কর্তব্য।

যে মানুষের প্রতি যে দায়িত্ব-কর্তব্য রয়েছে তা সুষ্ঠু ও আন্তরিকতার সাথে পালন করা জরুরি। অফিস, আদালতে, ক্ষেত-খামারে, কল-কারখানার ব্যবসায়-বাণিজ্যে তথা সকল ক্ষেত্রে নিজ নিজ দায়িত্ব-কর্তব্য নিষ্ঠার সাথে পালন করলে সমাজ এগিয়ে যাবে। উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিতে দেশ ভরে যাবে।

৯.৪ কর্তব্যে অবহেলার পরিণাম ভয়াবহ

কর্তব্যে অবহেলায় সমাজ ও দেশের মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়–

১. একজন ডাক্তারের অবহেলায় রোগী মারা যেতে পারে।
২. সজাতির অবহেলায় একটি গোটা সমাজ ধ্বংস হয়ে যেতে পারে।
৩. একজন সিগনাল ম্যানের অবহেলায় অনেক জানমালের ক্ষতি হতে পারে।
৪. চালকের অবহেলায় একটা গাড়ি দুর্ঘটনায় পতিত হতে পারে।
৫. একজন সৈনিকের অবহেলায় একটা যুদ্ধের মোড় ঘুরে যেতে পারে।
৬. একজন রাষ্ট্রনায়কের অবহেলায় একটা রাষ্ট্র ধ্বংস হয়ে যেতে পারে।

কাজেই সকলেরই কর্তব্যপরায়ণ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

আমাদের উপর যে সব দায়িত্ব-কর্তব্য রয়েছে, তা নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে আদায় করব।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৩.৯

ক. নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

মিলকরুন

১. কর্তব্য অর্থ।	১. যথাযথ দায়িত্ব পালন করা।
২. কর্তব্য পরায়নতা অর্থ।	২. হাক্কুল্লাহ
৩. সৃষ্টির প্রতি কর্তব্যকে বলা হয়।	৩. সমাজ ও দেশের মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে।
৪. স্রষ্টার প্রতি কর্তব্য হচ্ছে।	৪. হাক্কুল ইবাদ
৫. কর্তব্যে অবহেলায়	৫. যা করতে হবে।

খ. সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. কর্তব্য পরায়ণতা কী?
২. স্রষ্টা ও সৃষ্টির প্রতি কর্তব্য বলতে কী বোঝায়?
৩. নিজের প্রতি নিজের কি কর্তব্য রয়েছে?
৪. দেশ, জাতি ও মানবতার প্রতি কী কর্তব্য রয়েছে?
৫. কর্তব্য পালনে অবহেলার পরিণাম কী হতে পারে?

পাঠ ১০ হালাল উপার্জন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- হালাল উপার্জন কাকে বলে তা বলতে পারবেন
- হালাল উপার্জনের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন
- হালাল উপার্জনের উপায় উল্লেখ করতে পারবেন।

১০.১ হালাল উপার্জন

হালাল উপার্জন মানে বৈধ উপার্জন। আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশিত ও অনুমোদিত পন্থায় যে আয়-উপার্জন করা হয়, তাকে হালাল উপার্জন বলে। হালাল উপার্জন সকলের জন্য কল্যাণকর। নিজের জন্য যেমন কল্যাণকর, তেমনি সমাজের জন্যও সামাজিকভাবে কল্যাণময়। ইসলাম আয়-রোজগারে অবৈধ পন্থাগুলোকে সম্পূর্ণভাবে হারাম বা নিষিদ্ধ করেছে। আর অবৈধভাবে অর্জিত সম্পদকে অপবিত্র ও নাপাক বলে আখ্যায়িত করেছে। আল্লাহ মানুষকে আশরাফুল মাখলূকাত সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে অতীব সুন্দর গঠনে সৃজন করেছেন। দিয়েছেন উন্নত বিবেক-বিবেচনা ও আত্মা। দেহ সুস্থ রাখার জন্য জীবিকার প্রয়োজন। আর আত্মার কল্যাণের জন্য এবং হালাল জীবিকার জন্য হালাল উপার্জন অপরিহার্য। হালাল উপার্জনের উপরই বান্দার আত্মা পবিত্র থাকে এবং ইবাদত-বন্দেগী কবুল হয়।

১০.২ হালাল উপার্জনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

হালাল উপার্জন এবং হালাল উপার্জন দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করা ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। হারাম বা অবৈধ পন্থায় উপার্জিত সম্পদ দ্বারা গড়া শরীর জাহান্নামের ইন্ধন হবে। মুসলিম হিসেবে হালাল উপার্জন করা আমাদের ঈমানী দাবী।

হালাল উপার্জনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার কতিপয়, দিক নিম্নে আলোচনা করা হল-

১. হালাল উপার্জন অন্বেষণ ফরয

হালাল উপার্জনে মানুষের বিপুল কল্যাণ নিহিত। হারাম উপার্জনে রয়েছে দারুণ অকল্যাণ। তাই হালালভাবে উপার্জিত অর্থ মূলত মানব কল্যাণমূলক অর্থ।

আল্লাহ পাক মানুষ সৃষ্টি করেছেন তাঁরই ইবাদত-বন্দেগীর জন্য। ইবাদত করা যেমন ফরয, তেমনি হালাল উপার্জন বা হালাল রুযি অন্বেষণ করাও ফরয।

আল্লাহ পাকের নির্দেশ– "সালাত সমাপ্ত হয়ে গেলে পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়, আর আল্লাহর অনুগ্রহে জীবিকা অন্বেষণ কর- তথা উপার্জন কর। (সূরা জুমআ)

হালাল উপার্জন করা অন্যতম ফরয কাজ। মহানবী (স) বলেছেন–

طَلَبُ كَسْبِ الْحَلَالِ فَرِيْضَةٌ بَعْدَ الفَرِيْضَةِ

"হালাল রুযি অন্বেষণ করা ফরযের পরেও একটি ফরয।"

২. ইবাদতের পূর্বশর্ত হালাল উপার্জন

ইসলামের মৌলিক ইবাদতসমূহ কবুল হওয়ার পূর্বশর্ত হল হালাল রুযি। যার রুযি হালাল নয়, তার যাবতীয় ইবাদত- সালাত, সাওম, হাজ্জ-যাকাত কিছুই কবুল হবে না। কাজেই বোঝা যায় যে, ঈমানের পরে হালাল রুযি উপার্জন করে হালাল খাওয়া, হালাল পরা ফরয।

মহানবী (স) হাদীসে বলেছেন : দু'হাতের উপার্জিত হালাল খাদ্যের চেয়ে উত্তম খাদ্য আর কিছু নেই। মহানবী (স) আরো বলেছেন : "যে ব্যক্তি হালাল রুযি দ্বারা তার পরিবার-পরিজন প্রতিপালনের চেষ্টা করে থাকে, সে আল্লাহর পথে মুজাহিদের ন্যায়।"

ইসলাম হালাল উপার্জনের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করার জন্য কঠোরভাবে নির্দেশ দেয়। কেননা, হালাল উপার্জন ব্যতীত ঈমানদার হওয়া যায় না। আল্লাহ বলেন :

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

"ওহে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা নিজেদের মধ্যে একজন অপরজনের অর্থ সম্পদ অবৈধভাবে ভক্ষণ করো না।" (সূরা বাকারা : ২৩)

শ্রমের দ্বারা হালাল উপায়ে অর্জিত খাদ্যই সর্বোত্তম খাদ্য। মহানবী (স) বলেন :

مَا اَكَلَ اَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا اَنْ يَاكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ

"দু'হাতের উপার্জিত খাদ্যের চেয়ে উত্তম খাদ্য কেউ কোন দিন খায়নি। (বুখারী)

৩. হালাল উপার্জন কর্মবিমুখতা দূর করে

হালাল উপার্জন করতে হলে মানুষকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটতে হয়। হালাল উপার্জনের জন্য তিলে তিলে সময় শ্রম, মেধা খরচ করতে হয়। এতে মানুষের মধ্যে কর্মবিমুখতা দূর হয়। মহানবী (স) বলেন :

اِذَا صَلَّيْتُمُ الْفَجْرَ فَلَا تَنَامُوْا عَنْ طَلَبِ اَرْزَاقِكُمْ

"তোমাদের ফজরের সালাত আদায় হয়ে গেলে জীবিকা অন্বেষণ না করে ঘুমিয়ে পড়ো না।"

হালাল উপার্জন করা মু'মিনের অধিকার। এ অধিকার থেকে বঞ্চিত করা অন্যায়। নিজ হাতে উপার্জন করে পৃথিবী থেকে নিজের প্রাপ্যটা অবশ্য ভোগ ব্যবহার করা কর্তব্য। অপরের আয়-উপার্জনের দিকে চেয়ে থাকা মু'মিনের জন্য শোভা পায় না। আল্লাহ বলেন :

وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا

"তোমার পার্থিব প্রাপ্যটা গ্রহণ করতে ভুলে থেকো না।" (সূরা কাসাস : ৭৭)

৪. সকল নবী-রাসূলের সুন্নাত

পৃথিবীতে যত নবী-রাসূল এসেছেন, তাঁরা সকলেই নিজ হাতে হালাল উপার্জন করে জীবিকা নির্বাহ করেছেন। তাই হালাল উপার্জন সকল নবী-রাসূলগণের সার্বজনীন সুন্নাত।

রাসূল (স) বলেছেন– "আল্লাহ কোন নবী পাঠাননি, যিনি ছাগল চরাননি। জিজ্ঞাস করা হল– আপনিও কি তাঁদের মত? তিনি বললেন, হ্যাঁ! আমি কয়েকটি পয়সার বিনিময়ে মক্কাবাসীদের ছাগল-ভেড়া চরাতাম।" (বুখারী)

মহানবী (স) হালাল উপার্জনের উৎসাহ দিয়ে বলেছেন : "তোমরা তোমাদের উত্তরাধিকারীগণকে পরমুখাপেক্ষী রেখে যাওয়ার চেয়ে তাদেরকে স্বচ্ছল ও বিত্তবান রেখে যাওয়া উত্তম।"

হালাল উপার্জন করার জন্য হযরত ওমর (রা) কঠোরভাবে নির্দেশ দান করে বলেন : "তোমাদের কেউ যেন জীবিকার্জনের চেষ্টায় নিরুৎসাহ হয়ে বসে না থাকে।"

১০.৩ হালাল উপার্জনের উপায়

হালালভাবে উপার্জন করার বেশ কিছু পন্থা ও পদ্ধতি আছে। অপরকে না ঠকিয়ে, মিথ্যার আশ্রয় না নিয়ে, প্রতারণা না করে বৈধ পন্থায় উপার্জন করাই হালাল উপার্জন। এজন্য যে সব পন্থা অবলম্বন করা যায়, নিম্নে তার একটি সংক্ষিপ্ত ধারণা দেয়া হল-

কায়িক শ্রম দ্বারা :

দৈনিক শ্রমের বিনিময়ে হালাল কাজ করে দেয়ার বিনিময়ে উপার্জন করা যায়। কায়িক পরিশ্রমের দ্বারা অনেক কাজই আছে, যার মাধ্যমে হালাল উপার্জন হতে পারে।

চাকরি-বাকরি করা :

সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে নির্দিষ্ট পারিশ্রমিকের বিনিময়ে চাকুরি-বাকরি করে হালাল উপার্জন করা যায়।

ব্যবসায়-বাণিজ্য করা :

আল্লাহ তা'আলা ব্যবসাকে হালাল করেছেন। মহানবী (স) বলেন : "ব্যবসায়-বাণিজ্যের মধ্যে রিযিকের দশ ভাগের নয় ভাগ জীবিকা রয়েছে।" কাজেই বৈধ জিনিসের বৈধভাবে ব্যবসা বাণিজ্য করে হালাল উপার্জন করা যায়। ব্যবসা-বাণিজ্য সৎভাবে করার ফযীলতও অপরিসীম। রাসূল (স) বলেছেন : "সৎ ব্যবসায়ী কিয়ামতের দিন শহীদদের সঙ্গী হবেন।"

অন্যান্য বৈধ কর্মসংস্থানের মাধ্যমে :

চাকরি-বাকরি, ব্যবসায়-বাণিজ্য ছাড়াও হালাল উপার্জনের বহু উপায় আছে। নতুন নতুন বৈধ-কর্মসংস্থানের মাধ্যমে হালাল উপার্জন করা যায়। যেমন–

* পশু পালনের মাধ্যমে,

* হাঁস-মুরগির খামার করা,

* মাছের চাষ করা,

* বৃক্ষ রোপণ করা,

* ছোট-বড় মাঝারি ধরনের নার্সারী,

* নানারকম কুটির শিল্প প্রভৃতির মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান গড়ে তোলা যায়। আর এর মাধ্যমে হালাল উপার্জন করা যায়। এসব কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে যেমন আত্মনির্ভরশীল হওয়া যায় তেমনি দেশ-জাতি ও সমাজের প্রভূত উন্নয়ন এবং কল্যাণ করা যায়।

সার-সংক্ষেপ
হালাল উপার্জন এক অপরিহার্য বিষয়। জীবনের যা কিছু প্রয়োজন, যা না হলে জীবন ধারণ করা সম্ভব নয়, তা হালালভাবেই অর্জন করতে হবে। কাজেই হালাল উপার্জনে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৩.১০

ক. নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন : সঠিক উত্তর বেছে দিন।

১. আত্মা ও দেহের কল্যাণের জন্য এবং হালাল জীবিকার জন্য হালাল উপার্জন / কায়িক পরিশ্রম/ কাজ করা অপরিহার্য।

২. হালাল উপার্জন মানে অন্যায় পথে রোজগার / বৈধ উপার্জন / কায়িক পরিশ্রম।

৩. হারাম বা অবৈধ পথে উপার্জিত সম্পদ দ্বারা গড়া শরীর জান্নাতের সওগাত / আরামদায়ক জীবনের উপর / জাহান্নামের ইন্ধন।

৪. হালাল উপার্জন করা ফরয / নফল / অবৈধ।

৫. ইবাদতের পূর্ব শর্ত অযূ করা / নামায পড়া / হালাল উপার্জন।

৬. শ্রমের দ্বারা হালাল উপায়ে অর্জিত খাদ্য সর্বোত্তম খাদ্য / নিকৃষ্ট খাদ্য / কষ্টদায়ক খাদ্য।

৭. অপরের আয়-উপার্জনের দিকে চেয়ে থাকা মুমিনের জন্য শোভা পায় না / কল্যাণময় কাজ / নিকৃষ্টতর কাজ।

খ. সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. হালাল উপার্জন মানে কী?

২. হালাল উপার্জনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করুন।

৩. "ইবাদত কবুল হওয়ার জন্য হালাল উপার্জন পূর্ব শর্ত"-ব্যাখ্যা করুন।

৪. "হালাল উপার্জন কর্মবিমুখতা দূর করে"- বিশ্লেষণ করুন।

৫. কি উপায়ে হালাল উপার্জন করা যায়? বিবরণ দিন।

পাঠ ১১ হারাম উপার্জন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- হারাম উপার্জন কি তা বলতে পারবেন।
- হারাম উপার্জনের কুফল ও পরিণাম বর্ণনা করতে পারবেন।

১১.১ হারাম উপার্জন

হালাল উপার্জনের বিপরীত হারাম উপার্জন। আল্লাহ ও রাসূল (স) যে সব পন্থায় আয়-উপার্জন করতে নিষেধ করেছেন, সেটাই হারাম। হারাম-হালাল নির্ধারণ করার অধিকার আল্লাহ ও রাসূল (স) ছাড়া আর কারও নেই। ন্যায়-নীতি বর্জিত মানবতা বিরোধী, মানুষের জন্য ক্ষতিকর পন্থায় আয়-উপার্জনকে হারাম উপার্জন বলা হয়। আল্লাহ ও রাসূল (স) যে সব পন্থায় আয় উপার্জন করতে নিষেধ করেছেন, সেটাই হারাম উপার্জন। হারামভাবে উপার্জন ব্যক্তি নিজের ও মানব সমাজের জন্য মারাত্মক পরিণাম বয়ে আনে। হারাম উপার্জনের মাধ্যমে উপার্জিত ধন-সম্পদ ভোগ করাও হারাম। আর হারাম দ্বারা যে দেহ গঠিত হবে, তা জাহান্নামের ইন্ধন হবে। তাই হারাম উপার্জন থেকে দূরে থাকা প্রতিটি মু'মিন-মুসলিমদের অপরিহার্য কর্তব্য।

১১.২ হারাম উপার্জনের কয়েকটি দিক

মদ, মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরের মাংস বেচা-কেনা হারাম। জুয়ার মাধ্যমে, প্রতারণা করে, ছল-চাতুরী করে উপার্জন হারাম। ব্যবসায় বাণিজ্যে-ভেজাল করা, মজুদ করে মূল্য বৃদ্ধি, ওজনে কম-বেশি করা হারাম। সুদ-কারবার করা হারাম। ঘুষের মাধ্যমে উপার্জন হারাম। পরের সম্পদ আত্মসাৎ করা, চুরি-ডাকাতি, ছিনতাই, চাঁদাবাজির মাধ্যমে উপার্জন হারাম। বেশ্যা ও পতিতা বৃত্তির মাধ্যমে উপার্জন হারাম। যেসব দ্রব্য ভোগ ব্যবহার হারাম তার কেনা-বেচার মাধ্যমে উপার্জন করাও হারাম। গান-বাজনা-নৃত্য জাতীয় পেশার অবলম্বন হারাম। অশ্লীলতার প্রসার ঘটে এরূপ কার্যক্রমের মাধ্যমে উপার্জন হারাম।

১১.৩ হারাম উপার্জনের কুফল ও পরিণাম

হারাম উপার্জনের কুফল খুবই ভয়াবহ, আর এর পরিণামও অত্যন্ত খারাপ। নিম্নে হারাম উপার্জনের কু-ফল ও পরিণামের কিছু দিক তুলে ধরা হল :

জাহান্নামের ইন্ধন :

কুরআন ও হাদীসে সৎ ব্যবসায়ীদের যেমন জান্নাতের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে, তেমনি অসৎ ব্যবসায়ীদের কঠিন আযাবের খবর দেয়া হয়েছে। মহানবী (স) বলেন : "যে শরীর হারামে গঠিত, তা জাহান্নামের ইন্ধন হবে।"

মুনাফিক ও ফাসিক অবস্থায় উঠবে : রাসূল (স) বলেন, "কিয়ামতের দিন মুত্তাকী, সত্যবাদী এবং নেককার ব্যবসায়ী ছাড়া অন্য সব ব্যবসায়ী ফাসিক হয়ে উঠবে।

ব্যবসা-বাণিজ্য হালাল, কিন্তু সুদ হারাম। কারণ, এটি ন্যায়-নীতি বর্জিত, নিপীড়নমূলক উপার্জন। আল্লাহ বলেন :

أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا

"আল্লাহ তায়ালা ক্রয়-বিক্রয় হালাল করে দিয়েছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন।" (সূরা বাকারা : ২৭৫)

অভিশপ্ত জীবন :

হাদীসে আছে রাসূল (স) সুদখোর, সুদদাতা, তার দলিল লেখক এবং সাক্ষীদ্বয়ের প্রতি লা'নত করেছেন। প্রতারক ব্যবসায়ীর উপর আল্লাহ ও ফেরেশতাদের অভিশাপ বর্ষিত হয়।

অন্যায় ও অবৈধভাবে কিছু হাসিল করার জন্য কাউকে অবৈধভাবে কিছু দেয়াকে ঘুষ বা উৎকোচ বলে। ঘুষ হচ্ছে অবৈধ, প্রতারণামূলক অন্যায় উপার্জন। তাই ইসলামে ঘুষ হারাম।

মহানবী (স) বলেন :

اَلرَّاشِىْ وَالْمُرْتَشِىْ كِلَاهُمَا فِى النَّارِ

"ঘুষদাতা ও ঘুষগ্রহীতা উভয়ই জাহান্নামী।"

আর এক হাদীসে আছে,

لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ اَلرَّاشِىْ وَالْمُرْتَشِىْ وَالرَّائِقِ يَعْنِىْ الَّذِىْ يَمْشِىْ بَيْنَهُمَا

"রাসূলুল্লাহ (স) ঘুষদাতা, গ্রহীতা এবং এর লেনদেনের দালালদের প্রতি অভিশাপ দিয়েছেন। (আহমাদ, তাবরানী)

হারাম উপার্জনকারী শয়তানের দোসর। আল্লাহ তায়ালা বলেন :

يَاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖ وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

"হে মানব সম্প্রদায়, দুনিয়ায় যা কিছু আছে, তা থেকে হালাল পবিত্র বস্তু গ্রহণ কর, আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে না। সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।" (সূরা বাকারা : ১৬৮)

ইবাদত কবুল হয় না : হারাম উপার্জনের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করলে ইবাদত কবুল হয় না।

পরিণাম জাহান্নাম : মহানবী (স) বলেছেন,

كُلُّ جَسَدٍ نَبَتَتْ مِنْ سُحْتٍ فَالنَّارُ اَوْلٰى بِهٖ

"সুদের খাদ্যে পরিপুষ্ট যে দেহ, নরকাগ্নিই তার জন্য উপযুক্ত স্থান।" (বায়হাকী)

আমানতের খিয়ানত : হারাম উপার্জন আমানতের খিয়ানত। কারণ, আমানতের খিয়ানত করেই হারাম উপার্জন করা হয়। আর এটা বড়ই অন্যায় ও পাপ।

ঈমানের পরিপন্থী

হারাম উপার্জন ঈমানের পরিপন্থী। কুরআন ও হাদীসের আলোকে বুঝা যায়, হারাম উপার্জনকারী প্রকৃত মুমিন নয়।

হারাম পথে উপার্জনকারী মুসলিম উম্মাহর মধ্যে গণ্য হয়না। মহানবী (স) এ শ্রেণীর লোকদেরকে ইসলাম থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন, সম্পর্কহীন বলে ঘোষণা দিয়েছেন এবং এদেরকে উম্মাতের বহির্ভূত বলে মত প্রকাশ করেছেন।

প্রার্থনা কবুল হয় না : অবৈধ উপার্জনকারীর দুআ ও প্রার্থনা আল্লাহর দরবারে কবুল হয় না। অবৈধ উপার্জনের সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় সাদকা করলেও তা পবিত্র বা কবুল হয়না।

সার-সংক্ষেপ
ইসলাম যাবতীয় অন্যায় ও অবৈধ পন্থায় আয়-উপার্জনকে হারাম ঘোষণা করেছে। আর হারাম পন্থায় অর্জিত সম্পদকে অপবিত্র ও নাপাক আখ্যা দেয়া হয়েছে। অবৈধ সম্পদের দ্বারা লালিতপালিত দেহ জাহান্নামের ইন্ধন হবে। তাই হারাম উপার্জন সর্বতোভাবে বর্জন করতে হবে। হালাল উপার্জনের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করতে হবে। যত কষ্টই হোক হারাম উপার্জন ত্যাগ করে হালালের দিকে সকলেরই আসা অপরিহার্য। এতেই ব্যক্তি ও সমাজের উন্নতি ও মুক্তি নিহিত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৩.১১

ক. নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন : শূন্য স্থানে সঠিক শব্দ বসিয়ে পূরণ করুন।

হালাল উপার্জনের বিপরীত .... উপার্জন। আল্লাহ ও রাসূল যে সব পন্থায় আয়-উপার্জন করতে .... করেছেন, সেটাই....... । হালাল ও হারাম নির্ধারণ করা .... ও ...... ছাড়া আর কারও নেই। .... বর্জিত মানবতা ...., মানুষের জন্য ক্ষতিকর পন্থায় আয়-উপার্জনকে .... বলা হয়। হারাম উপার্জনের মাধ্যমে উপার্জিত ধন-সম্পদ .... করাও হারাম। আর হারামের দ্বারা যে দেহ গঠিত হবে, তা জাহান্নামের .... হবে।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. হারাম ও উপার্জন বলতে কী বোঝায়?
২. হারাম উপার্জনের কয়েকটি দিক উল্লেখ করুন।
৩. হারাম উপার্জনের কুফল নির্ণয় করুন।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন-৩

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. আত্ম পরিচিতি দিন। আত্ম-শুদ্ধি বলতে কী বোঝায়? আত্ম-শুদ্ধির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করুন।

২. মানব জীবনে উন্নতির উপায় নির্ণয় করুন।

৩. মানব জীবনে অবনতির কারণ উল্লেখ করুন।

৪. তাকওয়া কাকে বলে? ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে তাক্ওয়ার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার বিবরণ দিন।

৫. সিদক বা সত্যবাদিতা কী? সত্যবাদিতার উপকারিতা ও মিথ্যার অপকারিতা বর্ণনা করুন।

৬. ছবর কী? ছবরের প্রকারভেদ উল্লেখ করে ছবরের গুরুত্ব ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

৭. যিকর কী? যিকরের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন।

৮. শোকর বলতে কী বুঝায়? শোকর-এর তাৎপর্য ও প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করুন।

৯. কর্তব্য পরাণয়তা বলতে কী বোঝায়? কর্তব্য পরায়ণতার ক্ষেত্রসমূহ উল্লেখ করুন।

১০. হালাল উপার্জন কী? হালাল উপার্জনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করুন এবং হালাল উপার্জনের উপায়সমূহ লিখুন।

১১. হারাম উপার্জন বলতে কী বোঝায় হারাম উপার্জনের পরিণাম ব্যাখ্যা করুন।